আর্টস ই-বুক
bdnews24.com

বাংলার
কথা-সাহিত্য

ঠাকুরমার ঝুলি

বাংলার রূপকথা

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

ঠাকুরমার ঝুলি

প্রথম প্রকাশ: ১৯০৭

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

জন্ম: ১৫ এপ্রিল ১৮৭৭ (২ বৈশাখ ১২৮৪)
মৃত্যু: ৩০ মার্চ ১৯৫৬ (১৬ চৈত্র ১৩৬৩)

১৯০৭ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশের আগে দক্ষিণারঞ্জনের লেখা ও সংগৃহীত রূপকথা কলকাতার কিছু পত্রিকায় ছাপা হয়। ‘ঠাকুরমার ঝুলি’র পাণ্ডুলিপির প্রকাশক না পেয়ে নিজের অর্থেই প্রকাশে উদ্যোগী হন দক্ষিণারঞ্জন। এ সময় দীনেশচন্দ্র সেনের সাথে যোগাযোগ ঘটে তাঁর। পরে দীনেশচন্দ্র সেনের উদ্যোগেই সেকালের বিখ্যাত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান *ভট্টাচার্য অ্যান্ড সন্স* থেকে ১৯০৭ সালে গ্রন্থাগারে প্রকাশিত হয় ‘ঠাকুরমার ঝুলি’।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার উলাইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার মাতার নাম কুসুমময়ী ও পিতার নাম রমদারঞ্জন মিত্র মজুমদার। ১৮৮৭ সালে দশ বছর বয়সে তাঁকে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি করে দেওয়া হয় ঢাকার কিশোরীমোহন হাইস্কুলে। পরে ১৮৯৩ সালে, কিশোরীমোহন হাইস্কুল থেকে দক্ষিণারঞ্জণকে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি করে দেয়া হয়। এ দুটি স্কুলে থাকার সময় পড়ালেখায় ভালো করতে না পারায় তাঁর পিতা টাঙ্গাইলে বাসরত বোন (দক্ষিণারঞ্জনের পিসী) রাজলক্ষ্মী চৌধুরানীর কাছে রেখে টাঙ্গাইলের সন্তোষ জাহ্নবী হাইস্কুলে ভর্তি করে দেন। এই স্কুলের বোর্ডিং- এ থেকে তিনি দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা করেন। কিন্তু পিতার হঠাৎ সিদ্ধান্তে টাঙ্গাইল ছেড়ে ১৮৯৭ সালে বহরমপুর হাইস্কুলে তাকে দশম শ্রেণীতে ভর্তি করানো হয়। এই স্কুল থেকেই ১৮৯৮ সালে প্রথম বিভাগে

তিনি এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এন্ট্রান্স পাসের পর দক্ষিণারঞ্জনকে বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলেজে এফ এ ক্লাসে ভর্তি করানো হয়। কিন্তু তিনি পড়ালেখা শেষ করেননি।

তাঁর অন্যান্য বই হলো, মা বা আহুতি (১৯০৮), ঠাকুরমার ঝুলি (১৯০৯), আর্যনারী (প্রথম ভাগ ১৯০৮, দ্বিতীয় ভাগ ১৯১০), চারু ও হারু (১৯১২), দাদামশায়ের থলে (১৯১৩), খোকাখুকুর খেলা (১৯০৯), আমাল বই (১৯১২), সরল চন্ডী (১৯১৭), পুবার কথা (১৯১৮), ফার্স্ট বয় (১৯২৭), উৎপল ও রবি (১৯২৮), কিশোরদের মন (১৯৩৩), কর্মের মূর্তি (১৯৩৩), বাংলার সোনার ছেলে (১৯৩৫), সবুজ লেখা (১৯৩৮), চিরদিনের রূপকথা (১৯৪৭), আশীর্বাদ ও আশীর্বাণী (১৯৪৮) ইত্যাদি। ‘চারু ও হারু’ সম্ভবতঃ বাংলা ভাষায় প্রথম কিশোরদের জন্য উপন্যাস। এছাড়া ১৯০১ সালে তিনি ‘সুধা’ নামে একটি মাসিক সাময়িক পত্রিকা নিজ সম্পাদনায় প্রকাশ করেন। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ছবি আঁকতেন, ঠাকুরমার ঝুলি’র ছবিগুলো তাঁর আঁকা। এছাড়াও বাসগৃহে কাঠের উপর খোদাই কর্মে তাঁর বিশেষ পারদর্শিতা ছিল।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার পরবর্তিতে কোন এক সময় (জানা যায়নি) কোলকাতায় স্থায়ী হন এবং তাঁর কোলকাতার নিজস্ব ভবন ‘সাহিত্যভবন’- এ ১৯৫৬ সালে মারা যান।

আর্টস ই- বুক সিরিজে প্রকাশিত হলো দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের ‘ঠাকুরমার ঝুলি’। ঠাকুরমার ঝুলি’র চিত্রসমূহ দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের আঁকা। আর্টস সংস্করণে এগুলো সংযোজিত হলো। সংযোজনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের গড় গতির আনুমানিক পরিমাণ বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। একারণে ‘ফাইল সাইজ’ রাখার জন্য ভালো মানের চিত্র দেওয়া হয়নি। বাংলাদেশের ইন্টারনেটের গতি সামগ্রিকভাবে আরো ভালো হলে পরবর্তি কোন সংস্করণে সন্তোষজনক মানের চিত্র সংযোজন করা হবে। এছাড়া প্রথম প্রকাশে ঠাকুরমার ঝুলির ভূমিকা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আর্টস সংস্করণে সেই ভূমিকাটি সংযোজিত হলো, সাথে গ্রন্থকারের নিবেদন। মোটের উপর, আর্টস সংস্করণে সম্ভব ক্ষেত্রে ঠাকুরমার ঝুলির প্রথম প্রকাশকে অনুসরণ করা হয়েছে, আবার পরবর্তি সংস্করণগুলোর সংযোজনগুলোকেও যুক্ত করা হয়েছে।

.... আর্টস ই বুক ......
http://arts.bdnews24.com

(bdnews24.com থেকে ১৫/ ২/ ২০১১ তারিখে প্রকাশিত)

সূচীপত্র

- ভূমিকা
- গ্রন্থকারের নিবেদন
- উৎসর্গ
- দুধের সাগর
- কলাবতী রাজকন্যা
- ঘুমন্ত পুরী
- কাঁকনমালা, কাঞ্চনমালা
- সাত ভাই চম্পা
- শীত বসন্ত
- কিরণমালা
- রূপতরাসী
- নীলকমল আর লালকমল
- ডালিম কুমার
- পাতাল- কন্যা মণিমালা
- সোনার কাটি রূপার কাটি
- চ্যাং ব্যাং
- শিয়াল পণ্ডিত
- সুখু আর দুখু
- ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী
- দেড় আঙ্গুলে
- আম সন্দেশ
- ফুরাল

ভূমিকা

ঠাকুরমার ঝুলিটির মত এত বড় স্বদেশী জিনিস আমাদের দেশে আর কি আছে? কিন্তু হায় এই মোহন ঝুলিটিও ইদানীং ম্যাঞ্চেস্টারের কল হইতে তৈরী হইয়া আসিতেছিল। এখনকার কালে বিলাতের "Fairy Tales" আমাদের ছেলেদের একমাত্র গতি হইয়া উঠিবার উপক্রম করিয়াছে। স্বদেশের দিদিমা কোম্পানী একেবারে দেউলে'। তাঁদের ঝুলি ঝাড়া দিলে কোন কোন স্থলে মার্টিনের এথিক্স এবং বার্কের ফরাসী বিপ্লবের নোটবই বাহির হইয়া পড়িতে পারে, কিন্তু কোথায় গেল—রাজপুত্র পাত্তরের পুত্র, কোথায় বেঙ্গমা- বেঙ্গমী, কোথায়—সাত সমুদ্র তেরো নদী পারের সাত রাজার ধন মাণিক।

পাল পার্বণ যাত্রা গান কথকতা এ সমস্তও ক্রমে মরানদীর মত শুকাইয়া আসাতে, বাংলাদেশের পল্লীগ্রামে যেখানে রসের প্রবাহ নানা শাখায় বহিত, সেখানে শুষ্ক বালু বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে বয়স্কলোকদের মন কঠিন স্বার্থপর এবং বিকৃত হইবার উপক্রম হইতেছে। তাহার পরে দেশের শিশুরাও কোন পাপে আনন্দের রস হইতে বঞ্চিত হইল। তাহাদের সায়ংকালীন শয্যাতল এমন নীরব কেন? তাহাদের পড়াঘরের কেরোসিন্- দীপ্ত টেবিলের ধারে যে গুঞ্জনধ্বনি শুনা যায় তাহাতে কেবল বিলাতী বানান- বহির বিভীষিকা। মাতৃদুগ্ধ একেবারে ছাড়াইয়া লইয়া কেবলি ছোলার ছাতু খাওয়াইয়া মানুষ করিলে ছেলে কি বাঁচে !

কেবলি বইয়ের কথা! স্নেহময়ীদের মুখের কথা কোথায় গেল ! দেশলক্ষ্মীর বুকের কথা কোথায় !

এই যে আমাদের দেশের রূপকথা বহুযুগের বাঙ্গালী- বালকদের চিত্তক্ষেত্রের উপর দিয়া অশ্রান্ত বহিয়া কত বিপ্লব, কত রাজ্য পরিবর্তনের মাঝখান দিয়া অক্ষুণ্ন চলিয়া আসিয়াছে, ইহার উৎস সমস্ত বাংলা দেশের মাতৃস্নেহের মধ্যে। যে স্নেহ দেশের রাজ্যেশ্বর রাজা হইতে দীনতম কৃষককে পর্যন্ত বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছে, সকলকেই শুক্লসন্ধ্যায় আকাশে চাঁদ দেখাইয়া ভুলাইয়াছে এবং ঘুমপাড়ানি গানে শান্ত করিয়াছে, নিখিল রঙ্গদেশের সেই চির পুরাতন গভীরতম স্নেহ হইতে এই রূপকথা উৎসারিত।

অতএব বাঙ্গালীর ছেলে যখন রূপকথা শোনে তখন কেবল যে গল্প শুনিয়া সুখী হয়, তাহা নহে—সমস্ত বাংলা দেশের চিরন্তন স্নেহের সুরটি তাহার তরুণ চিত্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, তাহাকে যেন বাংলার রসে রসাইয়া লয়।

দক্ষিণারঞ্জনবাবুর ঠাকুরমা'র ঝুলি বইখানি পাইয়া, তাহা খুলিতে ভয় হইতেছিল। আমার সন্দেহ ছিল, আধুনিক বাংলার কড়া ইস্পাতের মুখে ঐ সুরটা পাছে বাদ পড়ে। এখনকার কেতাবী ভাষায় ঐ সুরটি বজায় রাখা বড় শক্ত। আমি হইলে ত এ কাজে সাহসই করিতাম না। ইতিপূর্বে কোন কোন গল্পকুশলা অথচ শিক্ষিতা মেয়েকে দিয়া আমি রূপকথা লিখাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছি—কিন্তু হৌক মেয়েলি হাত, তবুও বিলাতী কলমের যাদুতে রূপকথায় কথাটুকু থাকিলেও সেই রূপটি ঠিক থাকে না; সেই চিরকালের সামগ্রী এখনকার কালের হইয়া উঠে।

কিন্তু দক্ষিণাবাবুকে ধন্য! তিনি ঠাকুরমা'র মুখের কথাকে ছাপার অক্ষরে তুলিয়া পুঁতিয়াছেন তবু তাহার পাতাগুলি প্রায় তেমনি সবুজ,

তেমনি তাজাই রহিয়াছে; রূপকথার সেই বিশেষ ভাষা, বিশেষ রীতি, তাহার সেই প্রাচীন সরলতাটুকু তিনি যে এতটা দূর রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, ইহাতে তাহার সূক্ষ্ম রসবোধ ও স্বাভাবিক কলানৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে।

এক্ষণে আমার প্রস্তাব এই যে, বাংলাদেশের আধুনিক দিদিমাদের জন্য অবিলম্বে একটা স্কুল খোলা হউক এবং দক্ষিণাবাবুর এই বইখানি অবলম্বন করিয়া শিশু- শয়ন- রাজ্যে পুনর্বার তাঁহাদের নিজেদের গৌরবের স্থান অধিকার করিয়া বিরাজ করিতে থাকুন।

বোলপুর
২০শে ভাদ্র, ১৩১৪ শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গ্রন্থকারের নিবেদন

এক দিনের কথা মনে পড়ে, দেবালয়ে আরতির বাজান বাজিয়া বাজিয়া থামিয়া গিয়াছে, মা 'র আঁচলখানির উপর শুইয়া রূপকথা শুনিতেছিলাম।

" জ্যোচ্ছনা ফুল ফুটেছে" * ; মা'র মুখের এক একটি কথায় সেই আকাশে- নিখিল- ভরা জ্যোৎস্নার রাজ্যে, জ্যোৎস্নার সেই নির্মল শুভ্র পটখানির উপর পলে পলে কত বিশাল "রাজ-রাজত্ব", কত "অছিন্ অভিন্" রাজপুরী, কত চিরসুন্দর রাজপুত্র রাজকন্যার অবর্ণনীয় ছবি আমার শৈশব চক্ষুর সামনে সত্যকারটির মত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

সেই যেন কেমন —কতই সুন্দর! পড়ার বইখানি হাতে নিতে নিতে ঘুম পাইত; কিন্তু সেই রূপকথা তা 'রপর তা 'রপর তা 'রপার করিয়া কত রাত জাগাইয়াছে! তা'রপর শুনিতে শুনিতে শুনিতে শুনিতে, চোখ বুজিয়া আসিত; —সেই অজানা রাজ্যের সেই অচেনা রাজপুত্র সেই সাতসমুদ্র তের নদীর ঢেউ ক্ষুদ্র বুকখানির মধ্যে স্বপ্নের ঘোরে খেলিয়া বেড়াইত, আমার মত দুরন্ত শিশু! শান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িতাম।

বাঙ্গালার শ্যামপল্লীর কোণে কোণে এমনি আনন্দ ছিল, এমনি আবেশ ছিল। মা আমার অফুরণ রূপকথা বলিতেন। —জানিতেন বলিলে ভুল হয়, ঘর- কন্নায় রূপকথা যেন জড়ানো ছিল; এমন গৃহিণী ছিলেন না যিনি রূপকথা জানিতেন না, —না জানিলে যেন লজ্জার কথা ছিল। কিন্ত এত শীঘ্র সেই সোনা- রূপার কাটি কে

নিল, আজ মনে হয়, আর ঘরের শিশু তেমন করিয়া জাগে না তেমন করিয়া ঘুম পাড়ে না

বঙ্গীয় সাহিত্য- পরিষৎ বাঙ্গালীকে এত অতি মহাব্রতে দীক্ষিত করিয়াছেন; হারানো সুরের মণিরত্ন মাতৃভাষার ভাণ্ডারে উপহার দিবার যে অতুল প্রেরণা, তাহা মূল ঝরণা হইতেই জাগরিত হইয়া উঠিয়াছে দেশজননীর স্নেহধারা — এই — বাঙ্গালার রূপকথা।

মা'র মুখের অমৃত- কথার শুধু রেশগুলি মনে ভাসিত; পরে' কয়েকটি পল্লীগ্রামের বৃদ্ধার মুখে আবার যাহা শুনিতে শুনিতে শিশুর মত হইতে হইয়াছিল, সে সব ক্ষীণ বিচ্ছিন্ন কঙ্কালের উপরে প্রায় এক যুগের শ্রমের ভূমিতে এই ফুল- মন্দির রচিত। বুকের ভাষার কচি পাপড়িতে সুরের গন্ধের আসন: কেমন হইয়াছে বলিতে পারি না।

অবশেষে বসিয়া বসিয়া ছবিগুলি আঁকিয়াছি। যাঁদের কাছে দিতেছি, তাঁহারা ছবি দেখিয়া হাসিলে, জানিলাম আঁকা ঠিক হইয়াছে।

শরতের ভোরে ঝুলিটি আমি সোনার হাটের মাঝখানে আনিয়া দিলাম। আমার মা'র মতন মা বাঙ্গালার ঘরে ঘরে আবার দেখিতে পাই। যাদের কাজ তাঁরা আবার আপন হাতে তুলিয়া নেন।

যেমন চাহিয়াছিলাম, হয়তো হয় নাই; কিন্তু বই যে সত্বরে প্রকাশিত হইল, ইহার ব্যবস্থায়" বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে " র আমার

অগ্রজ - প্রতিম সুহৃদ্বর শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ই অগ্রণী। তাঁহার আদরের ‘ঝুলি’ তাঁহার ঋণ শোধ করিতে পারিবে না।

আমার ছোট বোন্টি অনেক খুঁটিনাটিতে সাহায্য করিয়াছে। প্রিয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বিমলাকান্ত সেন মুদ্রণাদিতে প্রাণপাতে আমার জন্য খাটিয়াছেন। তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতার, ভাষা নাই।

জ্যোৎস্নাবিধৌত স্নিগ্ধ সন্ধ্যায় আরতির বাদ্য বাজিয়াছে। এ সুলগ্নে যাঁদের ঝুলি, তাঁদের কাছে দিয়া —বিদায় লইলাম।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার। কলিকাতা
প্রথম সংস্করণ, ভাদ্র ১৩১৪

উৎসর্গ

নীল আকাশে সূয্যিমামা ঝলক দিয়েছে,
সবুজ মাঠে নতুন পাতা গজিয়ে উঠেছে,
পালিয়ে ছিল সোনার টিয়ে ফিরে এসেছে;
ক্ষীর নদীটির পারে খোকন হাস্তে লেগেছে,
হাসতে লেগেছে রে খোকন নাচতে লেগেছে,
মায়ের কোলে চাঁদের হাট ভেঙ্গে পড়েছে।
লাল টুক্ টুক্ সোনার হাতে কে নিয়েছে তুলি'
ছেঁড়া নাতা পুরোন কাঁথার —

ঠাকুরমার ঝুলি

— বাঙ্গলা- মা'র বুক- জোড়া ধন —
এত কি ছিল ব্যাকুল মন।

— ওগো। —
ঠাকুরমা'র বুকের মাণিক, আদরের 'খোকা খুকি '।
চাঁদমুখে হেসে, নেচে নেচে এসে, ঝুলির মাঝে দে উঁকি!

ওগো !
সুশীল সুবোধ, চারু হারু বিনু লীলা শশি সুকুমারি!
দ্যাখ তো রে এসে খোঁচা খুঁচি দিয়ে ঝুলিটারে
নাড়ি' চাড়ি '।

— ওগো। —
বড় বৌ, ছোট বৌ। আবার এসেছে ফিরে '
সেকালের সেই রূপকথাগুলো তোমার আঁচল ঘিরে '!
ফুলে ফুলে বয় হাওয়া, ঘুমে ঘুমে চোখ ঢুলে,
কাজগুলো সব লুটুপুটি খায় আপন কথার ভুলে।
এমন সময় খুঁটে লুটে ' এনে হাজার যুগের ধূলি
চাঁদের হাটের মাঝখানে '— মা—! ধুপুষ্ করা —
ঝুলি!!

* * *

হাজার যুগের রাজপুত্র রাজকন্যা সবে
রূপসাগরে সাঁতার দিয়ে আবার এল কবে !
হাঁউ মাঁউ কাঁউ শব্দ শুনি রাক্ষসেরি পুর —
না জানি সে কোন্ দেশে না জানি কোন্ দূর!
নতুন বৌ! হাঁড়ি ঢাক ', শিয়াল পণ্ডিত ডাকে; —
হেঁটে কাঁটা উপরে কাঁটা কোন্ রানীদের পাপে?
তোমাদেরি হারাধন তোমাদেরি ঝুলি
আবার এনে ঝেড়ে' দিলাম সোনার হাতে তুলি '!
ছেলে নিয়ে মেয়ে নিয়ে কাজে কাজে এলা —
সোনার শুকের সঙ্গে কথা দুপুর সন্ধ্যা বেলা,
দুপুর সন্ধ্যা বেলা লক্ষ্মি! ঘুম যে আসে ভুলি '!
ঘুম ঘুম ঘুম,
— সুবাস কুম্ কুম্ —
ঘুমের রাজ্যে ছড়িয়ে দিও
ঠাকুরমা'র
এ
ঝুলি।

গাছের আগায় চিক্- মিক্
আমার খোকন্ হাসে ফিক্ - ফিক্।
নীলাম্বরীখান গায়ে দিয়ে, খোকার — মাসি এসেছে!
নদীর জলে খোকার হাসি ঢেলে ' পড়েছে!

আয় রে আমার কাজ্লা বুধি, আয় রে আমার হুমো, —
গাছের আড়ে থামল রে চাঁদ, আমার, সোনার মুখে চুমো !

ঘরে ঘরে লক্ষ্মীমণির পিদিম জ্বলেছে,
দেবতার দুয়ারে কাঁসর বেজে ’ উঠেছে —
    নাচবে খোকা,   নিবে প্রসাদ
খোকন্ আমার গঙ্গাপ্রসাদ —
কোন্ স্বর্গের ছবি খোকন্ মর্ত্যে এনেছে?

ও খোকন,   খোকন্ রে।
আর নেচো না,   আর নেচো না নাচন ভেঙ্গে পড়েছে—!
দেখেস’ আঙ্গিনায় তোর কে এসেছে!
আঙ্গিনেয় এলো চাঁদের মা   দেখেস ’ খোকন্
দেখে যা,
ঝুলির ভেতর চাঁদের নাচন্ ভরে ’ এনেছে।
ঝুলির মুখ খোলা, — খোকার হাসি তোলা — তোলা —
ঠাকুরমা’র কোলটি জুড়ে কে রে বসেছে?

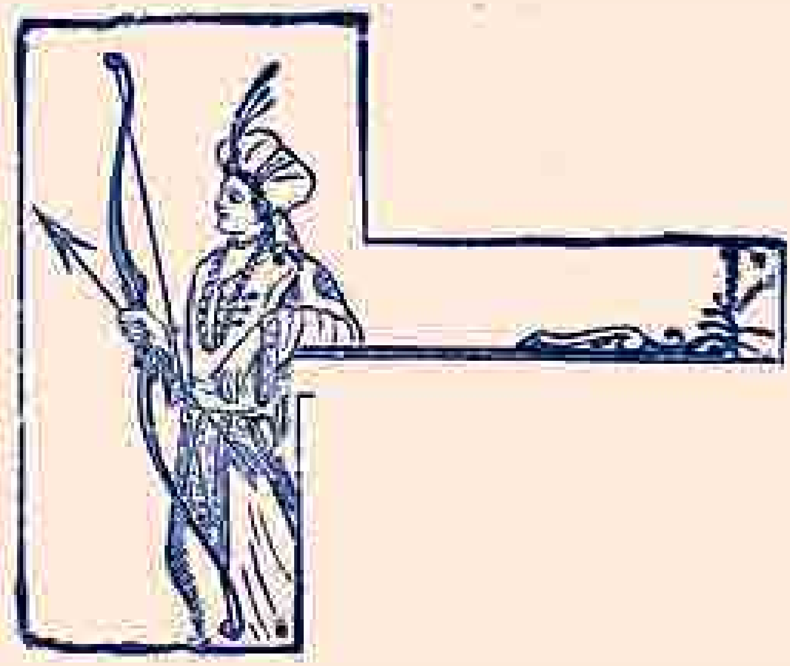

দুধের সাগর

হাজার যুগের রাজপুত্র রাজকন্যা সবে
রূপসাগরে সাঁতার দিয়ে আবার এল কবে।
*　　　　*　　　　*
শুকপঙ্খী নায়ে চড়ে ' কোন্ কন্যা এল '
পাল তুলে' পাঁচ ময়ূরপঙ্খী কোথায় ডুবে গেল,
পাঁচ রানী পাঁচ রাজার ছেলের শেষে হ 'ল কি,

কেমন দু’ ভাই বুদ্ধু, ভূতুম্, বানর পেঁচাটি!
নিঝুম ঘুমে পাথর - পুরী—কোথায় কত যুগ —
সোনার পদ্মে ফুটে’ ছিল রাজকন্যার মুখ!
রাজপুত্র দেশ বেড়াতে ’ কবে গেল কে —,
কেমন করে’ ভাঙ্গল সে ঘুম কোন্ পরশে!
ফুটল কোথায়, পাঁশগাদাতে সাত চাঁপা, পারুল,
ছুটে এল রাজার মালী তুলতে গিয়ে ফুল,
ঝুপ্ ঝুপ্ ঝুপ্ ফুলের কলি কার কোলেতে?
হেঁটে কাঁটা উপরে কাঁটা কাদের পাপে।
রাখাল বন্ধুর মধুর বাঁশি আজকে পড়ে মনে —
পণ করে’ পণ ভাঙ্গল রাজা; রাখাল- বন্ধুর সনে।
গা- ময় সূঁচ, পা - ময় সূঁচ—রাজার বড় জ্বালা, —
ডুব দে যে হলেন দাসী রাণী কাঞ্চনমালা!
মনে পড়ে দুয়োরানীর টিয়ে হওয়ার কথা,
দুঃখী দু’ভাই মা- হারা সে শীত- বসন্তের ব্যথা।
ছুটতো কোথায় রাজার হাতী পাটসিংহাসন নিয়ে;
গজমোতির উজল আলোয়, রাজকন্যার বিয়ে !
বিজন দেশে—কোথায় যে সে ভাসানে ভাই- বোন
গড়ল অবাক্ অতুল পুরী পরম মনোরম !
সোনার পাখি ভাঙ্গল স্বপন কবে কি গান গেয়ে —
লুকিয়ে ছিল এসব কথা ‘দুধ- সাগরের ’ ঢেউয়ে!

কলাবতী রাজকন্যা

(১)

এক যে, রাজা। রাজার সাত রাণী।–বড়রাণী, মেজরাণী, সেজরাণী, ন- রাণী, কনেরাণী, দুয়োরাণী, আর ছোটরাণী।

রাজার মস্ত- বড় রাজ্য; প্রকাণ্ড রাজবাড়ী। হাতীশালে হাতী ঘোড়াশালে ঘোড়া, ভাণ্ডারে মাণিক, কুঠরীভরা মোহর, রাজার সব ছিল। এ ছাড়া, – মন্ত্রী, অমাত্য, সিপাই, লস্করে, – রাজপুরী গমগম্ করিত।

কিন্তু, রাজার মনে সুখ ছিল না। সাত রাণী, এক রাণীরও সন্তান হইল না। রাজা, রাজ্যের সকলে, মনের দুঃখে দিন কাটেন।

একদিন রাণীরা নদীর ঘাটে স্নান করিতে গিয়াছেন, –এমন সময়, এক সন্ন্যাসী যে, বড়রাণীর হাতে একটি গাছের শিকড় দিয়া বলিলেন, - "এইটি বাটিয়া সাত রাণীতে খাইও, সোনার চাঁদ ছেলে হইবে।"

রাণীরা, মনের আনন্দে তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া আসিয়া, কাপড়- চোপড় ছাড়িয়া, গা- মাথা শুকাইয়া, সকলে পাকশালে গেলেন। আজ বড়রাণী ভাত রাঁধিবেন, মেজরাণী তরকারি কাটিবেন, সেজরাণী ব্যঞ্জন রাঁধিবেন, ন- রাণী জল তুলিবেন, কনেরাণী যোগান দিবেন, দুয়োরাণী বাটনা বাটিবেন, আর ছোটরাণী মাছ কুটিবেন। পাঁচ রাণী পাকশালে রহিলেন; ন- রাণী কূয়োর পাড়ে গেলেন, ছোটরাণী পাঁশগাদার পাশে মাছে কুটিতে বসিলেন।

সন্ন্যাসীর শিকড়টি বড়রাণীর কাছে। বড়রাণী দুয়োরাণীকে ডাকিয়া বলিলেন, – "বোন, তুই বাটনা বাটিবি, শিকড়টি আগে বাটিয়া দে না সকলে একটু একটু খাই।"

দুয়োরাণী শিকড় বাটিতে বাটিতে কতটুকু নিজে খাইয়া ফেলিলেন। তাহার পর, রূপার থালে সোনার বাটি দিয়া ঢাকিয়া, বড়রাণীর কাছে দিলেন। বড়রাণী ঢাকনা খুলিতেই আর কতকটা খাইয়া মেজরাণীর হাতে দিলেন। মেজরাণী খানিকটা খাইয়া, সেজরাণীকে দিলেন। সেজরাণী কিছু খাইয়া, কনেরাণীকে দিলেন। কনেরাণী বাকীটুকু খাইয়া ফেলিলেন। ন- রাণী আসিয়া দেখেন, বাটিতে একটু তলানী পড়িয়া আছে। তিনি তাহাই খাইলেন। ছোটরাণীর জন্য আর কিছুই রহিল না।

মাছ কোটা হইলে, ছোটরাণী উঠিলেন। পথে ন- রাণীর সঙ্গে দেখা হইল। ন- রাণী বলিলেন, –‘ ও অভাগি! তুই তো শিকড়বাটা খাইলি না?- যা, যা, শীগগির যা। ’’ ছোটরাণী আকুলি-ব্যাকুলি করিয়া ছুটিয়া আসিলেন; আসিয়া দেখিলেন, শিকড়বাটা একটুকুও নাই। দেখিয়া ছোটরাণী, আছাড় খাইয়া মাটিতে পড়িলেন।

তখন পাঁচ রাণীর এ- র দোষ ও দেয়; ও- র দোষ এ দেয়। এই রকম করিয়া সকলে মিলিয়া গোলমাল করিতে লাগিলেন।

ছোটরাণী আছাড় খাইয়া মাটিতে পড়িলেন

ছোটরাণীর হাতের মাছ আঙ্গিনায় গড়াগড়ি গেল, চোখের জলে আঙ্গিনা ভাসিল।

একটু পরে ন- রাণী আসিলেন। তিনি বলিলেন, –“ওমা! ওর জন্য কি তোরা কিছুই রাখিস্ নাই? কেমন লো তোরা! চল্ বোন ছোটরাণী, শিল- নোড়াতে যদি একাধটুকু লাগিয়া থাকে, তাই তোকে, ধুইয়া খাওয়াই। ঈশ্বর করেন তো, উহাতেই তোর সোনার চাঁদ ছেলে হইবে।”

অন্য রাণীরা বলিলেন, –“তা ’ই তো, তা’ ই তো, শিল- নোড়ায় আছে, তাই ধুইয়া দেও।” মনে মনে বলিলেন, –“শিল- ধোয়া জল খাইলে- সোনার চাঁদ না তো বানর চাঁদ ছেলে হইবে। ”

ছোটরাণী কাঁদিয়া- কাটিয়া শিল- ধোয়া জলটুকুই খাইলেন। তা ’র পর, ন- রাণীতে ছোটরাণীতে ভাগাভাগি করিয়া জল আনিতে গেলেন। আর- রাণীরা নানাকথা বলাবলি করিতে লাগিলেন।

(২)

দশ মাস দশ দিন যায়, পাঁচ রাণীর পাঁচ ছেলে হইল। এক- এক ছেলে যেন সোনার চাঁদ! ন- রাণী আর ছোটরাণীর কি হইল? বড়রাণীদের কথাই সত্য; ন- রাণীর পেটে এক পেঁচা আর ছোটরাণীর পেটে এক বানর হইল।

বড় রাণীদের ঘরের সামনে ঢোল- ডগর বাজিয়া উঠিল। ন- রাণী আর ছোটরাণীর ঘরে কান্নাকাটি পড়িয়া গেল।

রাজা আর রাজ্যের সকলে আসিয়া, পাঁচ রাণীকে জয়ডঙ্কা দিয়া ঘরে তুলিলেন। ন- রাণী, ছোটরাণীকে কেহ জিজ্ঞাসাও করিল না।

কিছুদিন পর, ন- রাণী চিড়িয়াখানার বাঁদী আর ছোটরাণী ঘুঁটেকুড়ানী দাসী হইয়া দুঃখে কষ্টে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

(৩)

ক্রমে ক্রমে রাজার ছেলেরা বড় হইয়া উঠিল; পেঁচা আর বানরও বড় হইল। পাঁচ রাজপুত্রের নাম হইল- হীরারাজপুত্র, মাণিকরাজপুত্র, মোতিরাজপুত্র, শঙ্খরাজপুত্র আর কাঞ্চনরাজপুত্র।

পেঁচার নাম হইল ভূতুম্
আর
বানরের নাম হইল বুদ্ধু।

পাঁচ রাজপুত্র পাঁচটি পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়ায়। তাহাদের সঙ্গে- সঙ্গে কত সিপাই লস্কর পাহারা থাকে। ভূতুম্ আর বন্ধু দুইজনে তাহাদের মায়েদের কুঁড়েঘরের পাশে একটা ছোট বকুলগাছের ডালে বসিয়া খেলা করে।

পাঁচ রাজপুত্রেরা বেড়াইতে বাহির হইয়া আজ ইহাকে মারে, কাল উহাকে মারে, আজ ইহার গর্দান নেয়, কাল উহার গর্দান নেয়; রাজ্যের লোক তিত- বিরক্ত হইয়া উঠিল।

ভূতুম্‌ আর বুদ্ধু পাঁচ রাজপুত্র

ভূতুম আর বুদ্ধু, দুইজনে খেলাধুলা করিয়া, যা 'র- যা' র মায়ের সঙ্গে যায়। বুদ্ধু মায়ের ঘুঁটে কুড়াইয়া দেয়, ভূতুম চিড়িয়াখানার পাখীর ছানাগুলিকে আহার খাওয়াইয়া দেয়। আর, দুই- একদিন পরুপর দুইজনে রাজবাড়ীর দক্ষিণ দিকে বনের মধ্যে বেড়াইতে যায়।

ভূতুমের মা চিড়িয়াখানার বাঁদী, বুদ্ধুর মা ঘুঁটে- কুড়ানী দাসী। কোনদিন খাইতে পায়, কোনদিন পায় না। বুদ্ধু দুই মায়ের জন্য বন জঙ্গল হইতে কত রকমের ফল আনে। ভূতুম্‌ ঠোঁটে করিয়া দুই মায়ের পান খাইবার সুপারী আনে। এই রকম করিয়া ভূতুম, ভূতুমের মা, বুদ্ধু, বুদ্ধুর মা' র দিন যায়।

একদিন পাঁচ রাজপুত্র পক্ষিরাজ ঘোড়া ছুটাইয়া চিড়িয়াখানা দেখিতে আসিলেন। আসিতে, পথে দেখিলেন, একটি পেঁচা আর

একটি বানর বকুল গাছে বসিয়া আছে। দেখিয়াই তাঁহারা সিপাই লস্করকে হুকুম দিলেন– "ঐ পেঁচা আর বানরটিকে ধর, আমরা উহাদিগে পুষিব।" অমনি সিপাই- লস্করেরা বকুল গাছে জাল ফেলিল। ভূতুম আর বুদ্ধু জাল ছিঁড়িতে পারিল না। তাহারা ধরা পড়িয়া, খাঁচায় বদ্ধ হইয়া রাজপুত্রদের সঙ্গে রাজপুরীতে আসিল।

চিড়িয়াখানা পরিষ্কার করিয়া ভূতুমের মা আসিয়া দেখেন, ভূতুম্ নাই! ঘুঁটে ছড়াইয়া বুদ্ধুর মা আসিয়া দেখেন, বুদ্ধু নাই ! ভূতুমের মা হাতের ঝাঁটা মাটিতে ফেলিয়া বসিয়া পড়িলেন, বুদ্ধুর মা গোবরের ঝাঁটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া আছাড় খাইয়া পড়িলেন।

(৪)

রাজপুরীতে আসিয়া ভূতুম্ আর বুদ্ধু অবাক!- মস্ত- মস্ত দালান; হাতী, ঘোড়া, সিপাই, লস্কর কত কি!

দেখিয়া তাহারা ভাবিল- "বা! তবে আমরা বকুল গাছে থাকি কেন? মায়েরাই বা কুঁড়েয় থাকে কেন? " ভাবিয়া তাহারা বলিল, – "ও ভাই রাজপুত্র, আমাদিগে আনিয়াছ তো, মাদিগেও আন। "

রাজপুত্রেরা দেখিলেন, –বাঃ! ইহারা তো মানুষের মতো কথা কয়! তখন বলিলেন- " বেশ বেশ তোদের মায়েরা কোথায় বল; আনিয়া চিড়িয়াখানায় রাখিব। "

ভূতুম্ বলিল, "চিড়িয়াখানার বাঁদী আমার মা। "

বুদ্ধু বলিল, – “ঘুঁটে- কুড়ানী দাসী আমার মা! ”
শুনিয়া রাজপুত্রেরা হাসিয়া উঠিলেন–

“মানুষের পেটে আবার পেঁচা হয়! ”
“মানুষের পেটে আবার বানর হয়! ”

ছোটরাণী আর ন- রাণীর কথা, রাজপুত্রেরা কি- না জানিতেন না, একজন সিপাই ছিল, সে বলিল, – “ হইবে না কেন? আমাদের দুই রাণী ছিলেন, তাঁহাদের পেটে পেঁচা আর বানর হইয়াছিল। রাজা সেইজন্য তাঁহাদিগে খেদাইয়া দেন। ইহারাই সেই পেঁচা আর বানর পুত্র।”

শুনিয়া রাজপুত্রেরা “ছি, ছি!” করিয়া উঠিলেন। তখনই খাঁচার উপর লাথি মারিয়া, রাজপুত্রেরা সিপাই- লস্করকে বলিলেন- “এই দুইটাকে খেদাইয়া দাও।” বলিয়া রাজ্যের ছেলেরা পক্ষিরাজে চড়িয়া বেড়াইতে চলিয়া গেলেন।

ভূতুম্ আর বুদ্ধু জানিল, তাহারাও রাজার ছেলে! ভূতুমের মা বাঁদী নয়, বুদ্ধুর মা দাসী নয়। তখন বুদ্ধু বলিল, –“দাদা, চল আমরা বাবার কাছে যাইব।”

ভূতুম্ বলিল, –“ চল।”

(৫)

সোনার খাটে গা, রূপার খাটে পা রাখিয়া রাজপুরীর মধ্যে, পাঁচ রাণীতে বসিয়া সিঁথিপাটি করিতেছিলেন। এক দাসী আসিয়া খবর

দিল, নদীর ঘাটে যে, শুকপঙ্খী নৌকা আসিয়াছে, তাহার রূপার বৈঠা, হীরার হা'ল। নায়ের মধ্যে মেঘ-বরণ চুল কুঁচ-বরণ কন্যা বসিয়া সোনার শুকের সঙ্গে কথা কহিতেছে।

অমনি নদীর ঘাটে পাহারা বসিল; রাণীরা উঠেন-কি-পড়েন, কে আগে কে পাছে; শুকপঙ্খী নায়ে কুঁচ-বরণ কন্যা দেখিতে চলিলেন।

তখন শুকপঙ্খী নায়ে পাল উড়িয়াছে; শুকপঙ্খী তরতর করিয়া ছুটিয়াছে।

রাণীরা বলিলেন—

‘‘কুঁচ-বরণ কন্যা মেঘ-বরণ চুল।
নিয়া যাও কন্যা মোতির ফুল।’’

শুকপঙ্খী নৌকা অনেক দূরে চলিয়া গেল

নৌকা হইতে কুঁচ- বরণ কন্যা বলিলেন, –

“মোতির ফুল মোতির ফুল সে বড় দূর,
তোমার পুত্র পাঠাইও কলাবতীর পুর।
হাটের সওদা ঢোল- ডগরে, গাছের পাতে ফল।
তিন বুড়ির রাজ্য ছেড়ে রাঙ্গা নদীর জল।”

বলিতে, বলিতে, শুকপঙ্খী নৌকা অনেক দূর চলিয়া গেল। রাণীরা সকলে বলিলেন—

“কোন্ দেশের রাজকন্যা কোন্ দেশে ঘর?
সোনার চাঁদ ছেলে আমার তো- মার বর।”

তখন শুকপঙ্খী আরও অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে; কুঁচ-বরণ কন্যা উত্তর করিলেন, –

"কলাবতী রাজকন্যা মেঘ-বরণ কেশ,
তোমার পুত্র পাঠাইও কলাবতীর দেশ।
আনতে পারে মোতির ফুল ঢোল-ডগর,
সেই পুত্রের বাঁদী হয়ে আসব তোমার ঘর।"

শুকপঙ্খী আর দেখা গেল না। রাণীরা অমনি ছেলেদের কাছে খবর পাঠাইলেন। ছেলেরা পক্ষিরাজ ছুটাইয়া বাড়িতে আসিল।

রাজা সকল কথা শুনিয়া ময়ূরপঙ্খী সাজাইতে হুকুম দিলেন। হুকুম দিয়া, রাজা, রাজসভায় দরবার করিতে গেলেন।

(৬)

মস্ত দরবার করিয়া রাজা রাজসভায় বসিয়াছেন। ভূতুম্ আর বুদ্ধু গিয়া সেইখানে উপস্থিত হইল। দুয়ারী জিজ্ঞাসা করিল, –"তোমরা কে?"

বুদ্ধু বলিল, –"বানররাজপুত্র।"
ভূতুম্ বলিল, –"পেঁচারাজপুত্র।"

দুয়ারী দুয়ার ছাড়িয়া দিল।

তখন বুদ্ধু এক লাফে গিয়া রাজার কোলে বসিল। ভূতুম উড়িয়া গিয়া রাজার কাঁধে বসিল। রাজা চমকিয়া উঠিলেন; রাজসভায় সকলে 'হাঁ! হাঁ!' করিয়া উঠিল।

বুদ্ধু ডাকিল, –"বাবা"
ভূতুম্ ডাকিল, –"বাবা!"

রাজসভার সকলে চুপ। রাজার চোখ দিয় টস্‌- টস্ করিয়া জল গড়াইয়া গেল। রাজা ভূতুমের গালে চুমা খাইলেন, বুদ্ধুকে দুই হা'ত দিয়া বুকে তুলিয়া লইলেন।

তখনি রাজসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া বুদ্ধু আর ভূতুমকে লইয়া রাজা উঠিলেন।

(৭)

এদিকে তো সাজ সাজ পড়িয়া গিয়াছে। পাঁচ নিশান উড়াইয়া

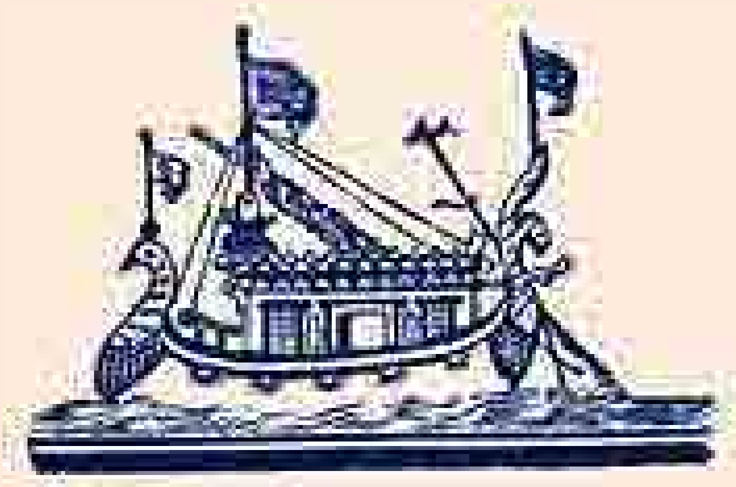

ময়ূরপঙ্খী নৌকা

পাঁচখানা ময়ূরপঙ্খী আসিয়া, ঘাটে লাগিল। রাজপুত্রেরা তাহাতে উঠিলেন। রাণীরা হুলুধ্বনি দিয়া পাঁচ রাজপুত্রকে কলাবতী রাজকন্যার দেশে পাঠাইলেন।

সেই সময়ে ভূতুম্ আর বুদ্ধুকে লইয়া, রাজা যে, নদীর ঘাটে আসিলেন।

বুদ্ধু বলিল, –"বাবা, ও কি যায় ?"
রাজা বলিলেন, – "ময়ূরপঙ্খী।"

বুদ্ধু বলিল, –"বাবা, আমরা ময়ূরপঙ্খীতে যাইব; আমাদিগে ময়ূরপঙ্খী দাও।"

ভূতুম্ বলিল, –“বাবা, ময়ূরপঙ্খী দাও।”
রাণীরা সকলে কিল্ কিল্ করিয়া উঠিলেন—
“কে লো, কে লো, বাঁদীর ছানা নাকি লো?”
“কে লো, কে লো, ঘুঁটে- কুড়ানীর ছা নাকি লো?”
“ও মা, ও মা, ছি! ছি !”

রাণীরা ভূতুমের গালে ঠোনা মারিয়া ফেলিয়া দিলেন, বুদ্ধুর গালে চড় মারিয়া ফেলিয়া দিলেন। রাজা আর কথা কহিতে পারিলেন না; চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রাণীরা রাগে গর্- গর্ করিতে- করিতে রাজাকে লইয়া রাজপুরীতে চলিয়া গেলেন।

বুদ্ধু বলিল, –“দাদা?”
ভূতুম্ বলিল, –“ভাই?”

বুদ্ধু।- “চল আমরা ছুতোরবাড়ী যাই, ময়ূরপঙ্খী গড়াইব; রাজপুত্রেরা যেখানে গেল, সেইখানে যাইব।”
ভূতুম্ বলিল, –“চল।”

(৮)

দিন নাই, রাত্রি নাই, কাঁদিয়া কাটিয়া ভূতুমের মা, বুদ্ধুর মায়ের দিন যায়। তাঁহারাও শুনিলেন, রাজপুত্রেরা ময়ূরপঙ্খী করিয়া

কলাবতী রাজকন্যার দেশে চলিয়াছেন। শুনিয়া দুইজনে, দুইজনের গলা ধরিয়া আরও কাঁদিতে লাগিলেন।

কাঁদিয়া- কাটিয়া দুই বোনে শেষে নদীর ধারে আসিলেন। তাহার পরে, দুইজনে দুইখানা সুপারীর ডোঙ্গায়, দুইকড়া কড়ি, ধান দূর্বা আর আগা- গলুইয়ে পাছা- গলুইয়ে সিন্দুরের ফোঁটা দিয়ে ভাসাইয়া দিলেন।

ডোঙ্গা ভাসাইয়া দিলেন

বুদ্ধুর মা বলিলেন, –

“বুদ্ধু আমার বাপ!
কি করেছি পাপ?

কোন্ পাপে ছেড়ে গেলি, দিয়ে মনস্তাপ?
শুকপঙ্খী নায়ের পাছে ময়ূরপঙ্খী যায়,
আমার বাছা থাক্লে, যেতিস্ মায়ের এই নায়।
পৃথিবীর যেখানে যে আছে ভগবান, –
আমার বাছার তরে দিলাম এই দূর্বা ধান।''

ভূতুমের মা বলিলেন—

"ভূতুম আমার বাপ!
কি করেছি পাপ?
কোন্ পাপে ছেড়ে গেলি, দিয়ে মনস্তাপ?
শুকপঙ্খী নায়ের পাছে ময়ূরপঙ্খী যায়,
আমার বাছা থাকলে যেতিস মায়ের এই নায়।
পৃথিবীর যেখানে যে আছ ভগবান্, –
আমার বাছার তরে দিলাম এই দূর্বা ধান।''

সুপারীর ডোঙ্গা ভাসাইয়া দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ভূতুমের মা, বুদ্ধুর মা কুঁড়েতে ফিরিলেন।

(৯)

ছুতোরের বাড়ী যাইতে-যাইতে পথে ভূতুম্ আর বুদ্ধু দেখিল, দুইখানি সুপারীর ডোঙ্গা ভাসিয়া যাইতেছে।

বুদ্ধু বলিল, "দাদা, এই তো আমাদের না'; এই নায়ে উঠ।''
ভূতুম, বলিল, –"উঠ।''

তখন, বুদ্ধু আর ভূতুম্ দুইজনে দুই নায়ে উঠিয়া বসিল। দুই ভাইয়ের দুই ময়ূরপঙ্খী যে পাশাপাশি ভাসিয়া চলিল।

লোকজনে দেখিয়া বলে—"ও মা! এ আবার কি?'
বুদ্ধু বলে, ভূতুম্ বলে, –"আমরা বুদ্ধু আর ভূতুম।"
বুদ্ধু ভূতুম্ যায়।

বুদ্ধু আর ভূতুমের ময়ূরপঙ্খী

আর, রাজপুত্রেরা? রাজপুত্রদের ময়ূরপঙ্খী যাইতে যাইতে তিন বুড়ীর রাজ্যে গিয়া পৌঁছিল। অমনি তিন বুড়ীর তিন বুড়া পাইক আসিয়া নৌকা আটকাইল। নৌকা আটকাইয়া তাহারা মাঝি-মাল্লা সিপাই-লস্কর সব শুদ্ধ পাঁচ রাজপুত্রকে থলে'র মধ্যে পুরিয়া তিন বুড়ীর কাছে নিয়া গেল।

তাহাদিগে দিয়া তিন বুড়ী তিন সন্ধ্যা জল খাইয়া, নাক ডাকাইয়া ঘুমাইয়া পড়িল!

অনেক রাত্রে, তিন বুড়ীর পেটের মধ্য হইতে রাজপুত্রেরা বলাবলি করিতে লাগিল, –

"ভাই, জন্মের মত বুড়ীদের পেটে রহিলাম। আর মা'দিগে দেখিব না, আর বাবাকে দেখিব না।"

এমন সময় কাহারা আসিয়া আস্তে আস্তে ডাকিল, –"দাদা! দাদা!"

রাজপুত্রেরা চুপি- চুপি উত্তর করিল, –"কে ভাই, কে ভাই? আমরা যে বুড়ীর পেটে!"

বাহির হইতে উত্তর হইল, –"আমার লেজ ধর"; "আমার পুচ্ছ ধর।" রাজপুত্রেরা লেজ ধরিয়া, পুচ্ছ ধরিয়া, বুড়ীদের নাকের ছিদ্র দিয়া বাহির হইয়া আসিল। আসিয়া দেখে; বুদ্ধু আর ভূতুম!

বুদ্ধু বলিল, –"চুপ, চুপ! শীগ্গীর তরোয়াল দিয়ে বুড়ীদের গলা কাটিয়া ফেল।"

রাজপুত্রেরা তাহাই করিলেন। রাজপুত্র, মাল্লা- মাঝি সকলে বাহির হইয়া আসিল। আসিয়া, সকলে তাড়াতাড়ি ময়ূরপঙ্খীতে পাল তুলিয়া দিল। বুদ্ধু আর ভূতুমকে কেহ জিজ্ঞাসাও করিল না।

ময়ূরপঙ্খী সারারাত ছুটিয়া ছুটিয়া ভোরে রাঙ্গা নদীর জলে গিয়া পড়িল। রাঙ্গা নদীর চারিদিকে কূল নাই, কিনারা নাই, কেবল রাঙ্গা জল।

মাঝিরা দিক হারাইল; পাঁচ ময়ূরপঙ্খী ঘুরিতে ঘুরিতে সমুদ্রে গিয়া পড়িল। রাজপুত্র মাল্লা - মাঝি সকলে হাহাকার করিয়া উঠিল।

সাত দিন সাত রাত্রি ধরিয়া ময়ূরপঙ্খীগুলি সমুদ্রের মধ্যে আছাড়িপিছাড়ি করিল। শেষে, নৌকা আর থাকে না; সব যায়- যায়!

রাজপুত্রেরা বলিলেন, –“হায় ভাই, বুদ্ধু ভাই থাকিলে আজি এখন রক্ষা করিত!” “হায় ভাই, ভূতুম ভাই থাকিলে এখন রক্ষা করিত!”

“কি ভাই, কি ভাই!
কি চাই, কি চাই?”

বলিয়া বুদ্ধু আর ভূতুম্ তাহাদের সুপারীর ডোঙ্গা ময়ূরপঙ্খীর গলুইয়ের সঙ্গে বাঁধিয়া থুইয়া, রাজপুত্রদের কাছে আসিল। আর, মাঝিদিগে বলিল, “উত্তর দিকে পাল তুলিয়া দে।”

দেখিতে-দেখিতে ময়ূরপঙ্খী সমুদ্র ছাড়াইয়া এক নদীতে আসিয়া পড়িল। নদীর জল যেন টলটল্ ছলছল্ করিতেছে। দুই পাড়ে আম-কাঁটালের হাজার গাছ। রাজপুত্রেরা সকলে পেট ভরিয়া আম, কাঁটাল খাইয়া, সুস্থির হইলেন।

তখন রাজপুত্রেরা বলিলেন, “ময়ূরপঙ্খীতে বানর আর পেঁচা কেন রে? এ দুইটাকে জলে ফেলিয়া দে।” মাঝিরা বুদ্ধু আর ভূতুমকে জলে ফেলিয়া দিল; তাহাদের সুপারীর ডোঙ্গা খুলিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিল। নদীর জলে ময়ূরপঙ্খী আবার চলিতে লাগিল।

চলিতে চলিতে এক জায়গায় আসিয়া পাঁচটি ময়ূরপঙ্খীই রাজপুত্র, মাল্লা, মাঝি সব লইয়া, ভুস করিয়া ডুবিয়া গেল। আর তাহাদের কোনও চিহ্ন-ই রহিল না।

কতক্ষণ পর, বুদ্ধু আর ভূতুমের ডোঙ্গা যে, সেইখানে আসিল। বুদ্ধু বলিল—“দাদা!”

ভূতুম্ বলিল, –‘‘কি?’’

বুদ্ধু!- ‘‘আমার মন যেন কেমন- কেমন করে, এইখানে কি যেন হইয়াছে। এস তো, ডুব দিয়া, দেখি।’’

ভূতুম্ বলিল, ‘‘হ’ক গে! ওরা মরিয়া গেলেই বাঁচি। আমি ডুবটুব দিতে পারিব না।’’

বুদ্ধু বলিল, –‘‘ছি, ছি, অমন কথা বলিও না। তা, তুমি থাক; এই আমার কোমরে সূতা বাঁধিলাম, যতদিন সূতাতে টান না দিব, ততদিন যেন তুলিও না।’’

ভূতুম্ বলিল, –‘‘আচ্ছা, তা’ পারি।’’

তখন বুদ্ধু নদীর জলে ডুব দিল; ভূতুম্ সূতা ধরিয়া বসিয়া রহিল।

(১২)

যাইতে যাইতে বুদ্ধু পাতাল- পুরীতে গিয়া দেখিল, এক মস্ত সুড়ঙ্গ। বুদ্ধু সুড়ঙ্গ দিয়া, নামিল।

সুড়ঙ্গ পার হইয়া বুদ্ধু দেখিল, এক যে - রাজপুরী! যেন ইন্দ্রপুরীর মত!!

কিন্তু সে রাজ্যে মানুষ নাই, জন নাই, কেবল এক একশ বচ্ছুরে’ বুড়ী বসিয়া একটি ছোট কাঁথা সেলাই করিতেছে। বুড়ী বুদ্ধুকে দেখিয়াই হাতের কাঁথা বুদ্ধুর গায়ে ছুঁড়িয়া মারিল। অমনি হাজার

হাজার সিপাই আসিয়া বুদ্ধুকে বাঁধিয়া- ছাঁদিয়া রাজপুরীর মধ্যে লইয়া গেল।

নিয়া গিয়া, সিপাইরা, এক অন্ধকুঠরীর মধ্যে, বুদ্ধুকে বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিল। অমনি কুঠরীর মধ্যে- ''বুদ্ধু ভাই, বুদ্ধু ভাই, আয় ভাই, আয় ভাই।'' বলিয়া অনেক লোক বুদ্ধুকে ঘিরিয়া ধরিল। বুদ্ধু দেখিল, রাজপুত্র আর মাল্লা - মাঝিরা!

বুদ্ধু বলিল, –''বটে! তা, আচ্ছা!''

পরদিন বুদ্ধু দাঁত মুখ সিটকাইয়া মরিয়া রহিল! এক দাসী রাজপুত্রদিগে নিত্য কি- না খাবার দিয়া যাইত! সে আসিয়া দেখে, কুঠরীর মধ্যে একটা বানর মরিয়া পড়িয়া আছে। সে যাইবার সময় মরা বানরটাকে ফেলিয়া দিয়া গেল। আর কি?- তখন বুদ্ধু আস্তে আস্তে চোখ মিটি- মিটি করিয়া উঠে। না, তো, এদিক ওদিক চাহিয়া বুদ্ধু, উঠিল। উঠিয়াই বুদ্ধু দেখিল প্রকাণ্ড রাজপুরীর তে- তলায় মেঘ- বরণ চুল কুঁচ- বরণ কন্যা সোনার শুকের সঙ্গে কথা কহিতেছে। বুদ্ধু গাছের ডালে- ডালে, দালানের ছাদে- ছাদে গিয়া, কুচ- বরণ কন্যার পিছনে দাঁড়াইল। তখন কুঁচ- বরণ কন্যা বলিতেছিলেন, –

''সোনার পাখী, ও রে শুক, মিছাই গেল
রূপার বৈঠা হীরার হা'ল—কেউ না এল!''

রাজকন্যার খোঁপায় মোতির ফুল ছিল, বুদ্ধু আস্তে- মোতির ফুলটি উঠাইয়া লইল।

তখন শুক বলিল,
“কুঁচ- বরণ কন্যা মেঘ- বরণ চুল,
কি হইল কন্যা, মোতির ফুল?”

রাজকন্যা খোঁপায় হাত দিয়া দেখিলেন, ফুল নাই।

শুক বলিল, –

“কলাবতী রাজকন্যা, চি’ন্তা না’ক আর,
মাথা তুলে’ চেয়ে দেখ, বর তোমার!”

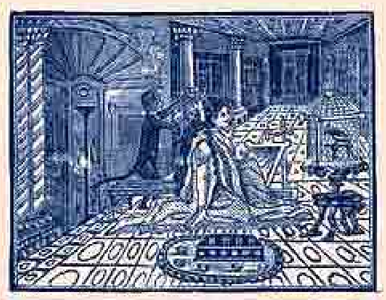
কি হইল কন্যা, মোতির ফুল?

কলাবতী, চমকিয়া পিছন ফিরিয়া দেখেন, –বানর! কলাবতীর মাথা হেঁট হইল। হাতের কাঁকণ ছুঁড়িয়া ফেলিয়া মেঘ- বরণ চুলের বেণী এলাইয়া দিয়া, কলাবতী রাজকন্যা মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন।

কিন্তু, রাজকন্যা কি করিবেন? যখন পণ করিয়াছিলেন, যে, তিন বুড়ীর রাজ্য পার হইয়া, রাঙ্গা- নদীর জল পাড়ি দিয়া, কাঁথা- বুড়ীর, আর, অন্ধকুঠরীর হাত এড়াইয়া তাঁহার পুরীতে আসিয়া যে মোতির ফুল নিতে পারিবে, সে- ই তাঁহার স্বামী হইবে। তখন রাজকন্য আর কি করেন?- উঠিয়া বানরের গলায় মালা দিলেন।

তখন বুদ্ধু হাসিয়া বলিল, “রাজকন্যা, এখন তুমি কা’র?”

রাজকন্যা বলিলেন, –‘‘আগে ছিলাম বাপের-মায়ের, তা’র পরে ছিলাম আমার; এখন তোমার।’’

বুদ্ধু বলিল, –‘‘তবে আমার দাদাদিগে ছাড়িয়া দাও, আর তুমি আমার সঙ্গে আমার বাড়ীতে চল। মা’দের বড় কষ্ট, তুমি গেলে তাঁহাদের কষ্ট থাকিবে না।’’

রাজকন্যা বলিলেন, –‘‘এখন তুমি যাহা বলিবে, তাহাই করিব। তা চল; –কিন্তু তুমি আমাকে এমনি নিতে পারিবে না, –আমি এই কৌটার মধ্যে থাকি, তুমি কৌটায় করিয়া আমাকে লইয়া চল।’’

বুদ্ধু বলিল, –‘‘আচ্ছা।’’

রাজকন্যা কৌটার ভিতর উঠিলেন।

অমনি শুকপাখী তাড়াতাড়ি গিয়া ঢোল-ডগরে ঘা দিল। দেখিতে দেখিতে রাজপুরীর মধ্যে এক প্রকাণ্ড হাট-বাজার বসিয়া গেল। রাজকন্যার কৌটা দোকানীর কৌটার সঙ্গে মিশিয়া গেল।

বুদ্ধু দেখিল, এ তো বেশ্ সে ঢোল-ডগর লইয়া বাজাইতে আরম্ভ করিয়া দিল। ঢোল-ডগরের ডাহিনে ঘা দিলে হাট-বাজার বসে, বাঁয়ে ঘা দিলে হাট-বাজার ভাঙ্গিয়া যায়। বুদ্ধু চোখ বুজিয়া বসিয়া বসিয়া বাজাইতে লাগিল। দোকানীরা দোকান উঠাইতে-নামাইতে উঠাইতে-নামাইতে একেবারে হয়রাণ হইয়া গেল, আর পারে না। তখন সকলে বলিল, –‘‘রাখুন, রাখুন, রাজকন্যার কৌটা নেন; আমরা আর হাট করিতে চাহি না।’’

বুদ্ধু ঢোল- ডগরের বাঁয়ে ঘা মারিল, হাট ভাঙ্গিয়া গেল। কেবল রাজকন্যার কৌটাটি পড়িয়া রহিল।

বুদ্ধু এবার আর কিন্তু ঢোলটি ছাড়িল না। ঢোলটি কাঁধে করিয়া কৌটার কাছে গিয়া ডাকিল, –

"রাজকন্যা রাজকন্যা, ঘুমে আছ কি?
বরে' নিতে ঢোল- ডগর নিয়ে এসেছি।"

রাজকন্যা কৌটা হইতে বাহির হইয়া বলিলেন- "আমার বড় ক্ষুধা পাইয়াছে, গাছের- পাতার ফল আনিয়া দাও, খাইব।"

বুদ্ধু বলিল, –"আচ্ছা।"

রাজকন্যা কৌটায় উঠিলেন। বুদ্ধু ঢোল কাঁধে কৌটা হাতে গাছের- পাতার- ফল আনিতে চলিল।

গাছের পাতার ফল

সেখানে গিয়া বুদ্ধু দেখিল, গাছের পাতায়- পাতায় কত রকম ফল ধরিয়া রহিয়াছে। দেখিয়া বুদ্ধুরও লোভ হইল ! কিন্তু, ও বাবা। এক যে অজগর—গাছের গোড়ায় সোঁ সোঁ করিয়া ফোঁসাইতেছে!

বুদ্ধু তখন আস্তে আস্তে গাছের চারিদিকে ঘুরিয়া আসিয়া এক দৌড় দিল। তাহার কোমরের সূতায় জড়াইয়া, অজগর, কাটিয়া

দুইখান হইয়া গেল। তখন বুদ্ধু গাছে উঠিয়া, পাতার ফল পাড়িয়া রাজকন্যাকে ডাকিল।

রাজকন্যা বলিলেন, –“আর না, সব হইয়াছে।... এখন চল, তোমার বাড়ী যাইব!”

বুদ্ধু বলিল, –“না, সব হয় নাই; রাজপুত্রদাদাদিগে আর বুড়ীর কাঁথাটি লইতে হইবে।” রাজকন্যা বলিলেন, “লও।”

বুড়ীর কাঁথা গায়ে বুদ্ধু

তখন পাঁচ রাজপুত্র, মাল্লা, মাঝি, ময়ূরপঙ্খী, স- ব লইয়া, ঢোল-ডগর কাঁধে, কৌটা হাতে, মোতির ফুল কানে, বুড়ীর কাঁথা গায়ে বুদ্ধু গাছের- পাতার- ফল খাইতে- খাইতে কোমরের সূতায় টান দিল।

ভূতুম্ বুঝিল এইবার বুদ্ধু আসিতেছে। সে সূতা টানিয়া তুলিল। পাঁচ রাজপুত্র, সিপাই- লস্কর, মাল্লা- মাঝি, ময়ূরপঙ্খী, সব লইয়া বুদ্ধু ভাসিয়া উঠিল।

ভাসিয়া উঠিয়া মাল্লা- মাঝিরা, ‘সার্ সার্’ করিয়া পাল তুলিয়া দিল। বুদ্ধু গিয়া ময়ূরপঙ্খীর ছাদে বসিল, পেঁচা গিয়া ময়ূরপঙ্খীর মাস্তুলে বসিল।

এবার সকলকে লইয়া ময়ূরপঙ্খী দেশে চলিল।

ছাদের উপর বুদ্ধু চোখ মিটি- মিটি করে আর মাঝে- মাঝে কৌটা খুলিয়া কাহার সঙ্গে যেন কথা হয়, হা’লের মাঝি, যে, রাজপুত্রদিগে এই খবর দিল।

খবর পাইয়া তাহারা চুপ।...রাত্রে সকলে ঘুমাইয়াছে, ভূতুম্ আর বুদ্ধুও ঘুমাইতেছে; সেই সময়, রাজপুত্রেরা চুপি-চুপি আসিয়া কৌটাটি সরাইয়া লইয়া, ঢোল-ডগর শিয়রে, বুড়ীর কাঁথা-গায়ে বুদ্ধুকে ধাক্কা দিয়া জলে ফেলিয়া দিলেন। ভূতুম্ মাস্তুলে ছিল, তার বুকে তীর মারিলেন। বুদ্ধু, ভূতুম্, জলে পড়িয়া ভাসিয়া গেল।

তখন কৌটা খুলিতেই, মেঘ-বরণ চুল কুঁচ-বরণ রাজকন্যা বাহির হইলেন। রাজপুত্রেরা বলিলেন, –"রাজকন্যা, এখন তুমি কা'র?"

রাজকন্যা বলিলেন, –"ঢোল-ডগর যা'র।"

শুনিয়া রাজপুত্রেরা বলিলেন, –"ও! তা' বুঝিয়াছি!- রাজকন্যাকে আটক কর।"

কি করিবেন? রাজকন্যা ময়ূরপঙ্খীর এক কুঠরীর মধ্যে আটক হইয়া রহিলেন।

(১৩)

রহিলেন- ময়ূরপঙ্খী আসিয়া ঘাটে লাগিল, আর রাজ্যময় সাজ সাজ পড়িয়া গেল। রাজা আসিলেন, রাণীরা আসিলেন, রাজ্যের সকলে নদীর ধারে আসিল।–মেঘ-বরণ চুল কুঁচ-বরণ কন্যা লইয়া রাজপুত্রেরা আসিয়াছেন।

রাণীরা ধান-দূর্বা দিয়া, পঞ্চদীপ সাজাইয়া, শাঁখ শঙ্খ বাজাইয়া কলাবতী রাজকন্যাকে বরণ করিয়া ঘরে তুলিলেন।

রাণীরা বলেলেন—“রাজকন্যা, তুমি কা’র?”
রাজকন্যা বলিলেন—“ঢোল- ডগর যা’র।”

“ঢোল- ডগর হীরারাজপুত্রের?”
“না।”
“ঢোল- ডগর মাণিকরাজপুত্রের?”
“না।”
“ঢোল- ডগর মোতিরাজপুত্রের?”
“না”
“ঢোল- ডগর শঙ্খরাজপুত্রের?”
“না।”
“ঢোল- ডগর কাঞ্চনরাজপুত্রের?”
“না।”

রাণীরা বলিলেন, –“তবে তোমাকে কাটিয়া ফেলিব।”

রাজকন্যা বলিলেন, –“আমার একমাস ব্রত, একমাস পরে যাহা ইচ্ছা করিও।”

তাহাই ঠিক হইল।

(১৪)

ভূতুমের মা, বুদ্ধুর মা, এতদিন কাঁদিয়া- কাঁদিয়া মর- মর। শেষে দুইজনে নদীর জলে ডুবিয়া মরিতে গেলেন।

এমন সময় একদিক হইতে বুদ্ধু ডাকিল, –“মা!”

আর একদিক হইতে ভূতুম্ ডাকিল, –“মা!”
দীন- দুঃখিনী দুই মায়ে ফিরিয়া চাহিয়া দেখেন, –

বুকের ধন হারামণি বুদ্ধু আসিয়াছে!

বুকের ধন হারামণি ভূতুম্ আসিয়াছে!

বুদ্ধুর মা, ভূতুমের মা, পাগলের মত হইয়া ছুটিয়া গিয়া দুইজনে দুইজনকে বুকে নিলেন। বুদ্ধু ভূতুমের চোখের জলে, তাঁহাদের চোখের জলে, পৃথিবী ভাসিয়া গেল।

বুদ্ধু ভূতুম্ কুঁড়েয় গেল।

পরদিন, সেই যে ঢোল- ডগর ছিল? চিড়িয়াখানার বাঁদী, ঘুঁটে- কুড়ানী দাসীর কুঁড়ের কাছে, মস্ত হাট- বাজার বসিয়া গিয়াছে। দেখিয়া লোক অবাক হইয়া গেল।

তাহার পরদিন, চিড়িয়াখানার বাঁদী, ঘুঁটে- কুড়ানী দাসীর কুঁড়ের চারিদিকে গাছের পাতায় পাতায় ফল ধরিয়াছে! দেখিয়া লোকেরা আশ্চর্যান্বিত হইয়া গেল। তাহার পরদিন, চিড়িয়াখানার বাঁদী, ঘুঁটে- কুড়ানী দাসীর কুঁড়ে ঘিরিয়া লক্ষ সিপাই পাহারা দিতেছে! দেখিয়া লোক সকল চমকিয়া গেল।

সেই খবর যে, রাজার কাছে গেল।

যাইতেই, সেইদিন কলাবতী রাজকন্যা বলিলেন, –“মহারাজ, আমার ব্রতের দিন শেষ হইয়াছে; আমাকে মারিবেন, কি, কাটিবেন, কাটুন।” শুনিয়া রাজার চোখ ফুটিল- রাজা সব বুঝিতে পারিলেন। বুঝিয়া রাজা বলিলেন, “মা, আমি সব বুঝিয়াছি। কে আমার আছ, ন- রাণীকে আর ছোটরাণীকে ঢোল- ডগর বাজাইয়া ঘরে আন।”

অমনি রাজপুরীর যত ঢাক ঢোল বাজিয়া উঠিল। কলাবতী রাজকন্যা, নূতন- জলে স্নান, নূতন কাপড়ে পরণ, ব্রতের ধান- দূর্বা মাথায় গুঁজিয়া, দুই রাণীকে বরণ করিয়া আনিতে আপনি গেলেন।

শুনিয়া, পাঁচ রাণী ঘরে গিয়া খিল দিলেন। পাঁচ রাজপুত্র ঘরে গিয়া কবাট দিলেন।

লক্ষ সিপাই লইয়া, ঢোল- ডগর বাজাইয়া ন- রাণী ছোটরাণীকে নিয়া কলাবতী রাজকন্যা রাজপুরীতে ফিরিয়া আসিলেন। বুদ্ধু ভূতুম্ আসিয়া রাজাকে প্রণাম করিল।

পরদিন মহা ধূম- ধামে মেঘ- বরণ চুল কুঁচ- বরণ কলাবতী রাজকন্যার সঙ্গে বুদ্ধুর বিবাহ হইল। আর- একদেশের রাজকন্যা হীরাবতীর সঙ্গে ভূতুমের বিবাহ হইল।

পাঁচ রাণীরা আর খিল খুলিলেন না! পাঁচ রাজপুত্রেরা আর কবাট খুলিলেন না ! রাজা পাঁচ রাণীর আর পাঁচ রাজপুত্রের ঘরের উপরে কাঁটা দিয়া, মাটি দিয়া, বুজাইয়া দিলেন।

ক'দিন যায়। একদিন রাত্রে, বুদ্ধুর ঘরে বুদ্ধু, ভূতুমের ঘরে ভূতুম, কলাবতী রাজকন্যা হীরাবতী রাজকন্যা ঘুমে। খু- ব রাত্রে হীরাবতী কলাবতী উঠিয়া দেখেন, –একি! হীরাবতীর ঘরে তো সোয়ামী নাই! কলাবতীর ঘরেও তো সোয়ামী নাই!- কি হইল, কি হইল? দেখেন, – বিছানার উপরে এক বানরের ছাল, বিছানার উপরে এক পেঁচার পাখ!!

''অ্যাঁ- দ্যাখ!- তবে তো এঁরা সত্যিকার বানর না, সত্যিকার পেঁচা না।''- দুই বোনে ভাবেন।- নানান্ খানান্ ভাবিয়া শেষে উঁকি দিয়া দেখেন- দুই রাজপুত্র ঘোড়ায় চাপিয়া রাজপুরী পাহারা দেয়। রাজপুত্রেরা যে দেবতার পুত্রের মত সুন্দর!

তখন, দুই বোনে যুক্তি করিয়া তাড়াতাড়ি পেঁচার পাখ বানরের ছাল প্রদীপের আগুনে পোড়াইয়া ফেলিলেন। পোড়াতেই, –গন্ধ!

গন্ধ পাইয়া দুই রাজপুত্র ঘোড়া ফেলিয়া ছুটিয়া আসিলেন। ছুটিয়া আসিয়া দেবকুমার দুই রাজপুত্র বলেন, –''সর্বনাশ, সর্বনাশ! এ কি করিলে!- সন্ন্যাসীর মন্ত্র ছিল, ছদ্মবেশে থাকিতাম, দেবপুরে যাইতাম আসিতাম, রাজপুরে পাহারা দিতাম, –আর তো সে সব করিতে পারিব না!- এখন, আর তো আমরা বানর পেঁচা হইয়া থাকিতে পারিব না!- কথা যে, প্রকাশ হইল!''

সোনার চাঁদ রাজপুত্র রাজার দুই পাশে

দুই রাজকন্যা ছিলেন থতমত, হাসিয়া বলিলেন, –‘‘তা’র আর কি? তবে তো ভালোই, তবে তো বেশ হইল। ও মা তবে না- কি পেঁচা?—তবে না- কি বানর?—আমরা কোথায় যাই!—’’

দুই রাজকন্যার ঘরে, আর কি?- সুখের নিশি, সুখের হাট। তা’র পরদিন ভোরে উঠিয়া সকলে দেখে, দেবতার মত মূর্তি দুই সোনার চাঁদ রাজপুত্র রাজার দুই পাশে বসিয়া আছে! দেখিয়া সকল লোকে চমৎকার মানিল।

কলাবতী রাজকন্যা বলিলেন, –‘‘উনি বানরের ছাল গায়ে দিয়া থাকিতেন; কা’ল রাত্রে আমি তাহা পোড়াইয়া ফেলিয়াছি।’’

আর- একদেশের রাজকন্যা হীরাবতী বলিলেন, –‘‘উনি পেঁচার পাখ গায়ে দিয়া থাকিতেন, কা’ল আমি তাহা পোড়াইয়া ফেলিয়াছি।’’

শুনিয়া সকলে ধন্য ধন্য করিল।
তা’রপর?—তা’রপর—

বুদ্ধুর নাম হইয়াছে—বুধকুমার,

ভূতুমের নাম হইয়াছে—রূপকুমার।

রাজ্যে আনন্দের জয়- জয়কার পড়িয়া গেল।

তাহার পর, ন- রাণী, ছোটরাণী, বুধকুমার, রূপকুমার আর কলাবতী রাজকন্যা, হীরাবতী রাজকন্যা, লইয়া, রাজা সুখে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

ঘুমন্ত পুরী

(১)

এক দেশের এক রাজপুত্র। রাজপুত্রের রূপে রাজপুরী আলো। রাজপুত্রের গুণের কথা লোকের মুখে ধরে না।

একদিন রাজপুত্রের মনে হইল, দেশভ্রমণে যাইবেন। রাজ্যের লোকের মুখ ভার হইল, রাণী আহার- নিদ্রা ছাড়িলেন, কেবল রাজা বলিলেন, —"আচ্ছা, যাক্।"

তখন দেশের লোক দলে- দলে সাজিল,
রাজা চর - অনুচর দিলেন,
রাণী মণি - মাণিক্যের ডালা লইয়া আসিলেন।

রাজপুত্র লোকজন, মণি- মাণিক্য চর- অনুচর কিছুই সঙ্গে নিলেন না। নূতন পোষাক পরিয়া, নূতন তরোয়াল ঝুলাইয়া রাজপুত্র দেশভ্রমণে বাহির হইলেন।

(২)

যাইতে যাইতে যাইতে যাইতে, কত দেশ, কত পর্বত, কত নদী, কত রাজার রাজ্য ছাড়াইয়া, রাজপুত্র এক বনের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইলেন! "দেখেন, বনে প'খ্- পাখালীর শব্দ নাই, বাঘ- ভালুকের সাড়া নাই ! —রাজপুত্র চলিতে লাগিলেন!

চলিতে চলিতে, অনেক দূর গিয়া রাজপুত্র দেখেন, বনের মধ্যে এক যে রাজপুরী—রাজপুরীর সীমা। অমন রাজপুরী রাজপুত্র আর কখনও দেখেন নাই! দেখিয়া রাজপুত্র অবাক হইয়া রহিলেন।

রাজপুরীর ফটকের চূড়া আকাশে ঠেকিয়াছে। ফটকের দুয়ার বন জুড়িয়া আছে। কিন্তু ফটকের চূড়ায় বাদ্য বাজে না, ফটকের দুয়ারে দুয়ারী নাই।

রাজপুত্র আস্তে আস্তে রাজপুরীর মধ্যে গেলেন!

রাজপুরীর মধ্যে গিয়া দেখেন, পুরী যে পরিষ্কার, যেন, দুধে ধোয়া, — ধব্ ধব্ করিতেছে। কিন্তু এমন পুরীর মধ্যে জন- মানুষ নাই, কোন কিছুর সাড়া - শব্দ পাওয়া যায় না, পুরী নিভাঁজ, নিঝুম, — পাতাটি পড়ে না, কূটাটুকু নড়ে না।

রাজপুত্র আশ্চর্য হইয়া গেলেন।

রাজপুত্র এদিক দেখেন, ওদিক দেখেন পুরীর চারিদিক দেখিতে লাগিলেন। একখানে গিয়া রাজপুত্র থমকিয়া গেলেন! দেখেন, মস্ত আঙ্গিনা, আঙ্গিনা জুড়িয়া হাতী, ঘোড়া, সেপাই, লস্কর, দুয়ারী, পাহারা, সৈন্য, সামন্ত সব সারি সারি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে!

রাজপুত্র হাঁক দিলেন!
কেহ কথা কহিল না,
কেহ তাঁহার দিকে ফিরিয়া দেখিল না।

অবাক হইয়া রাজপুত্র কাছে গিয়া দেখেন, কাতারে কাতারে সিপাই, লস্কর, কাতারে কাতারে হাতী ঘোড়া সব পাথরের মূর্তি হইয়া রহিয়াছে। কাহারও চক্ষে পলক পড়ে না কাহারও গায়ে চুল নড়ে না। রাজপুত্র আশ্চর্য হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

তখন রাজপুত্র পুরীর মধ্যে গেলেন।

এক কুঠরীতে গিয়া দেখেন, কুঠরীর মধ্যে কত রকমের ঢাল তরোয়াল, তীর, ধনুক সব হাজারে হাজারে টানানো রহিয়াছে। পাহারারা পাথরের মূর্তি, সিপাইরা পাথরের মূর্তি। রাজপুত্র আপনার তরোয়াল খুলিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া আসিলেন।

আর এক কুঠরীতে গিয়া দেখেন, মস্ত রাজদরবার, রাজদরবারে সোনার প্রদীপে ঘিয়ের বাতি জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে, চারিদিকে মণি- মাণিক্য ঝকঝক্ করিতেছে। কিন্তু রাজসিংহাসনে রাজা, পাথরমূর্তি, মন্ত্রীর আসনে মন্ত্রী পাথরমূর্তি, পাত্র - মিত্র ভাট বন্দী, সিপাই লস্কর যে যেখানে, সে সেখানে পাথরমূর্তি। কাহারও চক্ষে পলক নাই, কাহারও মুখে কথা নাই।

রাজপুত্র দেখেন, রাজার মাথায় রাজছত্র হেলিয়া আছে, দাসীর হাতে চামর ঢুলিয়া আছে, —সাড়া নাই, শব্দ নাই, সব ঘুমে নিঝুম। রাজপুত্র মাথা নোয়াইয়া চলিয়া আসিলেন।

আর এক কুঠরীতে গিয়া দেখেন, যেন কত শত প্রদীপ একসঙ্গে জ্বলিতেছে—কত রকমের ধন রত্ন, কত হীরা, কত মাণিক, কত মোতি, — কুঠরীতে আর ধরে না। রাজপুত্র কিছু ছুঁইলেন না; দেখিয়া, আর এক কুঠরীতে চলিয়া গেলেন।

সে কুঠরীতে যাইতে-না- যাইতে হাজার হাজার ফুলের গন্ধে রাজপুত্র বিভোর হইয়া উঠিলেন। কোথা হইতে এমন ফুলের গন্ধ আসে? রাজপুত্র কুঠরীর মধ্যে গিয়া দেখেন, জল নাই টল নাই, কুঠরীর মাঝখানে লাখে লাখে পদ্মফুল ফুটিয়া রহিয়াছে ! পদ্মফুলের গন্ধে ঘর ম'- ম' করিতেছে। রাজপুত্র ধীরে ধীরে ফুলবনের কাছে গেলেন।

ফুলবনের কাছে গিয়া রাজপুত্র দেখেন, ফুলের বনে সোনার খাঁট, সোনার খাটে হীরার ডাঁট, হীরার ডাঁটে ফুলের মালা দোলান রহিয়াছে; সেই মালার নীচে, হীরার নালে সোনার পদ্ম, সোনার পদ্মে এক পরমা সুন্দরী রাজকন্যা বিভোরে ঘুমাইতেছেন। ঘুমন্ত রাজকন্যার হাত দেখা যায় না, পা দেখা যায় না, কেবল চাঁদের কিরণ মুখখানি সোনার পদ্মের সোনার পাঁপড়ির মধ্যে টুল্- টুল্ করিতেছে। রাজপুত্র মতির ঝালর হীরার ডাঁটে ভর দিয়া, অবাক হইয়া দেখিতে লাগিলেন।

(৩)

দেখিতে দেখিতে, দেখিতে, দেখিতে, কত বচ্ছর চলিয়া গেল। রাজকন্যার আর ঘুম ভাঙ্গে না, রাজপুত্রের চক্ষে আর পলক পড়ে না।* রাজকন্যা অঘোরে ঘুমাইতেছেন, রাজপুত্র বিভোর হইয়া দেখিতেছেন।

চাঁদের কিরণ মুখখানি সোনার পদ্মের
সোনার পাপ্‌ড়ির মধ্যে টুল্‌টুল্‌
রাজকন্যার আর ঘুম ভাঙ্গে না,
রাজপুত্রের চক্ষে আর পলক পড়ে না।

হঠাৎ একদিন রাজপুত্র দেখেন, রাজকন্যার শিয়রে এক সোনার কাটি! রাজপুত্র আস্তে আস্তে সোনার কাটি তুলিয়া লইলেন।

সোনার কাটি তুলিয়া লইতেই দেখেন, আর এক দিকে এক রূপার কাটি। রাজপুত্র আশ্চর্য হইয়া রূপার কাটিও তুলিয়া লইলেন। দুই কাটি হাতে লইয়া রাজপুত্র নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিলেন।

দেখিতে দেখিতে, সোনার কাটিটি কখন টুক করিয়া ঘুমন্ত রাজকন্যার মাথায় ছুঁইয়া গেল! অমনি পদ্মের বন 'শিউরে' উঠিল, সোনার খাট নড়িয়া উঠিল, সোনার পাঁপড়ি ঝরিয়া পড়িল, রাজকন্যার হাত হইল, পা হইল; গায়ের আলস ভাঙ্গিয়া, চোখের পাতা কচ্লাইয়া ঘুমন্ত রাজকন্যা চমকিয়া উঠিয়া বসিলেন।

আর অমনি রাজপুরীর চারিদিকে পাখী ডাকিয়া উঠিল, দুয়ারে দুয়ারী আসিয়া হাঁক ছাড়িল, উঠানে হাতী ঘোড়া ডাক ছাড়িল, সিপাই তরোয়াল ঝন্‌ ঝন্‌ করিয়া উঠিল; রাজদরবারে রাজা

জাগিলেন, মন্ত্রী জাগিলেন, পাত্র জাগিলেন —হাজার বচ্ছরের ঘুম হইতে, যে যেখানে ছিলেন, জাগিয়া উঠিলেন —লোক লস্কর, সিপাই পাহারা, সৈন্য সামন্ত তীর— তরোয়াল লইয়া খাড়া হইল।

—সকলে অবাক হইয়া গেলেন —রাজপুরীতে কে আসিল!

রাজপুত্র অবাক হইয়া গেলেন,
রাজকন্যা অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন।

রাজা, মন্ত্রী জন- পরিজন সকলে আসিয়া দেখেন —রাজপুত্র রাজকন্যা মাথা নামাইলেন। রাজপুরীর চারদিকে ঢাক- ঢোল, শানাই - নাকাড়া বাজিয়া উঠিল !

রাজা বলিলেন, —"তুমি কোন্ দেশের ভাগ্যবান রাজার রাজপুত্র, আমাদিগে মরণ- ঘুমের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছ !"

জন- পরিজনেরা বলিল, —"আহা। আপনি কোন্ দেবতা- রাজার দেব রাজপুত্র—এক দৈত্য রূপার কাটি ছোঁয়াইয়া আমাদের গম্গমা সোনার রাজ্য ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়াছিল, —আপনি আসিয়া আমাদিগে জাগাইয়া রক্ষা করিলেন।

রাজপুত্র মাথা নোয়াইয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

রাজা বলিলেন, —"আমার কি আছে, কি দিব? —এই রাজকন্যা তোমার হাতে দিলাম, এই রাজত্ব তোমাকে দিলাম।"

চারিদিকে ফুল- বৃষ্টি, চারিদিকে চন্দন - বৃষ্টি; ফুল ফোটে, খৈ ছোটে, — রাজপুরীর হাজার ঢোলে 'ডুম্- ডুম্' কাটি পড়িল।

তখন, শতে শতে বাঁদী দাসী বাটনা বাটে, হাজারে হাজার দাই দাসী কুটনা কোটে;

দুয়ারে দুয়ারে মঙ্গল ঘড়া
পাঁচ পল্লব ফুলের তোড়া;
আল্পনা বিলিপনা, এয়োর ঝাঁক,
পাঠ- পিঁড়ী আসন ঘিরে', বেজে ওঠে শাঁখ।

সে কি শোভা! —রাজপুরীর চার- চত্বর দলদল্ ঝলমল্। আঙ্গিনায় আঙ্গিনায় হুলুধ্বনি, রাজভাণ্ডারে ছড়াছড়ি; জনজনতার হুড়াহুড়ি, —এতদিনের ঘুমন্ত রাজপুরী দাপে কাঁপে, আনন্দে তোলপাড়।

তাহার পর, ফুটফুটে চাঁদের আলোয় আগুন- পুরুত সম্মুখে, গুয়াপান, রাজ- রাজত্ব যৌতুক দিয়া, রাজা পঞ্চরত্ন মুকুট পরাইয়া রাজপুত্রের সঙ্গে রাজকন্যার বিবাহ দিলেন।

চারিদিকে জয়ধ্বনি উঠিল।

(৪)

এক বছর, দু' বছর, বছরের পর কত বছর গেল, —দেশভ্রমণে গিয়েছেন, রাজপুত্র আজও ফিরেন না। কাঁদিয়া কাঁদিয়া, মাথা খুঁড়িয়া রাণী বিছানা নিয়াছেন। ভাবিয়া ভাবিয়া, চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে রাজা অন্ধ হইয়াছেন। রাজ্য অন্ধকার, রাজ্যে হাহাকার।

একদিন ভোর হইতে- না - হইতে রাজদুয়ারে ঢাক - ঢোল বাজিয়া উঠিল, হাতী ঘোড়া সিপাই সান্ত্রীর হাঁকে দুয়ার কাঁপিয়া উঠিল!

রাণী বলিলেন, —“কি, কি?”
রাজা বলিলেন, —“কে, কে?”

রাজ্যের প্রজারা ছুটিয়া আসিল। রাজপুত্র- রাজকন্যা বিবাহ করিয়া লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন !!

কাঁপিতে কাঁপিতে রাজা আসিয়া রাজপুত্রকে বুকে লইলেন। পড়িতে- পড়িতে রাণী আসিয়া রাজকন্যাকে বরণ করিয়া নিলেন।

প্রজারা আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল।

রাজপুত্র রাজার চোখে সোনার কাটি ছোঁয়াইলেন, রাজার চোখ ভাল হইল। ছেলেকে পাইয়া, ছেলের বউ দেখিয়া রাণীর অসুখ সারিয়া গেল।

তখন, রাজপুত্র লইয়া, ঘুমন্ত পুরীর রাজকন্যা লইয়া, রাজা রাণী সুখে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

রাজপুত্র আর রাখাল

কাঁকনমালা, কাঞ্চনমালা

(১)

এক রাজপুত্র আর এক রাখাল, দুইজনে বন্ধু। রাজপুত্র প্রতিজ্ঞা করিলেন, যখন তিনি রাজা হইবেন, রাখাল বন্ধুকে তাঁহার মন্ত্রী করিবেন।

রাখাল বলিল, —“আচ্ছা।"

দুইজনে মনের সুখে থাকেন। রাখাল মাঠে গরু চরাইয়া আসে, দুই বন্ধুতে গলাগলি হইয়া গাছতলে বসেন। রাখাল বাঁশি বাজায়, রাজপুত্র শোনেন। এইরূপে দিন যায়।

(২)

রাজপুত্র রাজা হইলেন। রাজা রাজপুত্রের কাঞ্চনমালা রাণী, ভাণ্ডার ভরা মানিক, —কোথাকার রাখাল, সে আবার বন্ধু! রাজপুত্রের রাখালের কথা মনেই রহিল না।

একদিন রাখাল আসিয়া রাজদুয়ারে ধর্ণা দিল —“বন্ধু রাণী কেমন, দেখাইল না।” দুয়ারী তাঁহাকে “দূর, দূর” করিয়া খেদাইয়া দিল। মনের কষ্টে রাখাল কোথায় গেল, কেহই জানিল না।

(৩)

পরদিন ঘুম হইতে উঠিয়া রাজা চোখ মেলিতে পারেন না। কি হইল, কি হইল?— রাণী দেখেন, সকলে দেখে, রাজার মুখ- ময় সূঁচ, গা- ময় সূঁচ, — মাথার চুল পর্যন্ত সূঁচ হইয়া গিয়াছে। —এ কি হইল! —রাজপুরীতে কান্নাকাটি পড়িল।

সূঁচ রাজা

রাজা খাইতে পারেন না, শুইতে পারেন না, কথা কহিতে পারেন না। রাজা মনে মনে বুঝিলেন, রাখাল-বন্ধুর কাছে প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিয়াছি, সেই পাপে এ- দশা হইল। কিন্তু মনের কথা কাহাকেও বলিতে পারেন না।

সূঁচরাজার রাজসংসার অচল হইল, —সূঁচরাজা মনের দুঃখে মাথা নামাইয়া বসিয়া থাকেন; রাণী কাঞ্চনমালা দুঃখে- কষ্টে কোন রকমে রাজত্ব চালাইতে লাগিলেন।

(৪)

একদিন রাণী নদীর ঘাটে স্নান করিতে গিয়াছেন, কাহার এক পরমাসুন্দরী মেয়ে আসিয়া বলিল, —"রাণী যদি দাসী কিনেন, তো, আমি দাসী হইব।" রাণী বলিলেন —"সূঁচরাজার সূঁচ খুলিয়া দিতে পার তো আমি দাসী কিনি।"

দাসী স্বীকার করিল।

তখন রাণী, হাতের কাঁকন দিয়া দাসী কিনিলেন।

দাসী বলিল, —" রাণী মা, তুমি বড় কাহিল হইয়াছ; কতদিন না- জানি ভাল করিয়া খাও না, নাও না। গায়ের গহনা ঢিলা হইয়াছে, মাথার চুল জটা দিয়াছে। তুমি গহনা খুলিয়া রাখ, বেশ করিয়া ক্ষার - খৈল দিয়া স্নান করাইয়া দেই। "

রাণী বলিলেন, "না মা, কি আর স্নান করিব, —থাক।"

দাসী তাহা শুনিল না; রাণীর গায়ের গহনা খুলিয়া ক্ষার- খৈল মাখাইয়া দিল। দিয়া বলিল —"মা, এখন ডুব দাও। "

রাণী গলা- জলে নামিয়া ডুব দিলেন। দাসী চক্ষের পলকে রাণীর কাপড় পরিয়া, রাণীর গহনা গায়ে দিয়া ঘাটের উপর উঠিয়া ডাকিল—

“দাসী লো দাসী পান্- কৌ।
ঘাটের উপর রাঙ্গা বৌ!
রাজার রাণী কাঁকনমালা; —
ডুব দিবি আর কত বেলা? ”

রাণী ডুব দিয়া উঠিয়া দেখেন, দাসী রাণী হইয়াছে, তিনি বাঁদী হইয়াছেন। রাণী কপালে চড় মারিয়া, ভিজা চুলে কাঁপিতে কাঁপিতে কাঁকনমালার সঙ্গে চলিলেন।

(৫)

রাজপুরীতে গিয়া কাঁকনমালা পুরী মাথায় করিল। মন্ত্রীকে বলে, — “আমি নাইয়া আসিতেছি, হাতী ঘোড়া সাজাও নাই কেন?” পাত্রকে বলে, —“আমি নাইয়া আসিব, দোল- চৌদোলা পাঠাও নাই কেন?” মন্ত্রীর, পাত্রের গর্দান গেল।

সকলে চমকিল, এ আবার কি!—ভয়ে কেহ কিছু বলিতে পারিল না। কাঁকনমালা রাণী হইয়া বসিল, কাঞ্চনমালা দাসী হইয়া রহিলেন! রাজা কিছুই জানিতে পারিলেন না।

(৬)

তবে খাই তরমুজ

কাঞ্চনমালা আঁস্তাকুড়ে বসিয়া মাছ কোটেন আর কাঁদেন, —

“হাতের কাঁকন দিয়া কিনিলাম দাসী,
সেই হইল রাণী, আমি হইলাম বাঁদী।
কি বা পাপে সোনার রাজার রাজ্য গেল ছার
কি বা পাপে ভাঙ্গিল কপাল কাঞ্চনমালার?”

রাণী কাঁদেন আর চোখের জলে ভাসেন। রাজার কষ্টের সীমা নাই। গায়ে মাছি ভিনভিন্, সূঁচের জ্বালায় গা- মুখ চিনচিন্, কে বাতাস করে, কে বা ওষুধ দেয়!

(৭)

একদিন ক্ষার- কাপড় ধুইতে কাঞ্চনমালা নদীর ঘাটে গিয়াছেন। দেখেন, একজন মানুষ একরাশ সূতা লইয়া গাছতলায় বসিয়া বসিয়া বলিতেছে, —

“পাই এক হাজার সূঁচ,
তবে খাই তরমুজ!
সূঁচ পেতাম পাঁচ হাজার,
তবে যেতাম হাট- বাজার!

যদি পাই লাখ—
তবে দেই রাজ্যপাট!! ”

রাণী, শুনিয়া, আস্তে আস্তে গিয়া বলিলেন, “কে বাছা সূঁচ চাও, আমি দিতে পারি! তা সূঁচ কি তুমি তুলিতে পারিবে? ”

শুনিয়া, মানুষটা চুপচাপ সূতার পুঁটুলি তুলিয়া রাণীর সঙ্গে চলিল।

(৮)

পথে যাইতে যাইতে কাঞ্চনমালা, মানুষটির কাছে আপনার দুঃখের কথা সব বলিলেন। শুনিয়া, মানুষ বলিল, —“ আচ্ছা! ”

রাজপুরীতে গিয়া মানুষ রাণীকে বলিল, —“ রাণীমা, রাণীমা, আজ পিটা- কুড়ুলির ব্রত, রাজ্যে পিটা বিলাইতে হয়। আমি লালসুতা নীলসুতা রাঙাইয়া দি, আপনি গে ’ আঙ্গিনায় আলপনা দিয়া পিঁড়ি সাজাইয়া দেন; ও দাসী- মানুষ যোগাড়- যাগাড় দিক?”

রাণী আহ্লাদে আটখানা হইয়া বলিলেন, —“তা’ কেন, হইল- হইল দাসী, দাসীও আজ পিটা করুক।” তখন রাণী আর দাসী দুইজনেই পিটা করিতে গেলেন।

ও মা! রাণী যে, পিটা করিলেন, —আস্কে পিটা, চাস্কে পিটা আর ঘাস্কে পিটা! দাসী, —চন্দ্রপুলী, মোহনবাঁশি, ক্ষীরমুরলী, চন্দনপাতা এই সব পিটা করিয়াছেন।

মানুষ বুঝিল যে, কে রাণী আর কে দাসী।

পিটে- সিটে করিয়া, দুইজনে আলপনা দিতে গেলেন। রাণী, একমন চা'ল বাটিয়া সাত কলস জলে গুলিয়া এ —ই এক গোছা শনের নুড়ি ডুবাইয়া, সারা আঙ্গিনা লেপিতে বসিলেন। এখানে এক খাবল দেন, ওখানে এক খাবল দেন।

দাসী, আঙ্গিনার এক কোণে একটু ঝা'ড়- ঝুড় দিয়া পরিষ্কার করিয়া একটুকু চা'লের গুঁড়ায় খানিকটা জল মিশাইয়া, এতটুকু নেকড়া ভিজাইয়া, আস্তে আস্তে, পদ্ম- লতা আঁকিলেন, পদ্ম - লতার পাশে সোনার সাত কলস আঁকিলেন; কলসের উপর চূড়া, দুই দিকে ধানের ছড়া আঁকিয়া, ময়ূর, পুতুল, মা লক্ষ্মীর সোনা পায়ের দাগ, এই সব আঁকিয়া দিলেন।

তখন মানুষ কাঁকনমালাকে ডাকিয়া বলিল, —" ও বাঁদী! এই মুখে রাণী হইয়াছিস?"

হাতের কাঁকনের নাগন্ দাসী!
সেই হইল রাণী, রাণী হইলেন দাসী!

ভাল চাহিস তো, স্বরূপ কথা- ক'।"

কাঁকনমালার গায়ে আগুন হল্কা পড়িল। কাঁকনমালা গর্জিয়া উঠিয়া বলিল, — "কে রে পোড়ারমুখো দূর হ 'বি তো হ'।" জল্লাদকে ডাকিয়া বলিল, — "দাসীর আর ঐ নির্বংশে 'র গর্দান নেও; ওদের রক্ত দিয়া আমি স্নান করিব, তবে আমার নাম কাঁকনমালা।"

জল্লাদ গিয়া দাসী আর মানুষকে ধরিল। তখন মানুষটা পুঁটলি খুলিয়া বলিল, —

"সূতন সূতন নটখটি!
রাজার রাজ্যে ঘটমটি
সূতন সূতন নেবোর পো,
জল্লাদকে বেঁধে থো।"

এক গোছা সূতা গিয়া জল্লাদকে আষ্টে- পৃষ্ঠে বাঁধিয়া থুইল।

মানুষটা আবার বলিল, —"সূতন্ তুমি কা'র?" —
সূতা বলিল, —" পুঁটলী যা'র তা'র।"
মানুষ বলিল, —" যদি সূতন্ আমার খাও।
কাঁকনমালার নাকে যাও।"

সূতোর দুই গুটি গিয়া কাঁকনমালার নাকে ঢিবি হইয়া বসিল। কাঁকনমালা ব্যস্তে, মস্তে ঘরে উঠিয়া বলিতে লাগিল, —"দুঁয়ার দাঁও, দুঁয়ার দাঁও, এঁটা পাঁগন, দাসী পাঁগন নিয়া আঁসিয়াছে।"

পাগল তখন মন্ত্র পড়িতেছে —

"সূতন্ সূতন্ সরুলি, কোন্ দেশে ঘর?
সূঁচ- রাজার সূঁচে গিয়ে আপনি পর।"

দেখিতে- না - দেখিতে হিল হিল করিয়া লাখ সূতা রাজার গায়ের লাখ সূঁচে পরিয়া গেল।

তখন সূঁচেরা বলিল, —

"সূতার পরাণ সীলি সীলি, কোন ফুঁড়ন দি। "

মানুষ বলিল, —

"নাগন্ দাসী কাঁকনমালার চোখ- মুখটি।"

রাজা আর মন্ত্রী বন্ধু

রাজার গায়ের লাখ সূঁচ উঠিয়া গেল, লাখ সূঁচে কাঁকনমালার চোখ- মুখ সিলাই করিয়া রহিল। কাঁকনমালার যে ছটফটি!

রাজা চক্ষু চাহিয়া দেখেন, —
রাখাল বন্ধু!

রাজায় রাখালে কোলাকুলি করিলেন। রাজার চোখের জলে রাখাল ভাসিল, রাখালের চোখের জলে রাজা ভাসিলেন।

রাজা বলিলেন, —"বন্ধু, আমার দোষ নিও না, শত জন্ম তপস্যা করিয়াও তোমার মত বন্ধু পাইব না। আজ হইতে তুমি আমার মন্ত্রী। তোমাকে ছাড়িয়া আমি কত কষ্ট পাইলাম; —আর ছাড়িব না।"

রাখাল বলিল, —" আচ্ছা! তা তোমার সেই বাঁশিটি যে হারাইয়া ফেলিয়াছি; একটি বাঁশি দিতে হইবে! "

রাজা রাখাল- বন্ধুকে সোনার বাঁশি তৈয়ারী করাইয়া দিলেন। তাহার পর সূঁচের জ্বালায় দিন - রাত ছটফট্ করিয়া কাঁকনমালা মরিয়া গেল ! কাঞ্চনমালার দুঃখ ঘুচিল।

তখন, রাখাল, সারাদিন মন্ত্রীর কাজ করেন, রাত্রে চাঁদের আলোতে আকাশ ভরিয়া গেলে, রাজাকে লইয়া গিয়া নদীর ধারে সেই গাছের তলায় বসিয়া সোনার বাঁশি বাজান। রাজা গলাগলি করিয়া মন্ত্রী- বন্ধুর বাঁশি শোনেন। রাজা, রাখাল, আর কাঞ্চনমালার সুখে দিন যাইতে লাগিল।

সাত ভাই চম্পা

রাজার মালী

(১)

এক রাজার সাত রাণী। দেমাকে, বড়রাণীদের মাটিতে পা পড়ে না। ছোটরাণী খুব শান্ত। এজন্য রাজা ছোটরাণীকে সকলের চাইতে বেশি ভালবাসিতেন।

কিন্তু, অনেক দিন পর্যন্ত রাজার ছেলেমেয়ে হয় না। এত বড় রাজ্য, কে ভোগ করিবে? রাজা মনের দুঃখে থাকেন।

এইরূপে দিন যায়। কতদিন পরে, —ছোটরাণীর ছেলে হইবে। রাজার মনের আনন্দ ধরে না; পাইক- পিয়াদা ডাকিয়া, রাজা, রাজ্যে ঘোষণা করিয়া দিলেন, —রাজা রাজভাণ্ডার খুলিয়া দিয়াছেন, মিঠাইমণ্ডা মণি- মাণিক যে যত পার, আসিয়া নিয়া যাও।

বড়রাণীরা হিংসায় জ্বলিয়া মরিতে লাগিল।

রাজা আপনার কোমরে, ছোটরাণীর কোমরে, এক সোনার শিকল বাঁধিয়া দিয়া বলিলেন —“ যখন ছেলে হইবে, এই শিকলে নাড়া দিও, আমি আসিয়া ছেলে দেখিব! ” বলিয়া, রাজা, রাজদরবারে গেলেন।

ছোটরাণীর ছেলে হইবে, আঁতুড়ঘরে কে যাইবে? বড়রাণীরা বলিলেন, —“ আহা, ছোটরাণীর ছেলে হইবে, তা অন্য লোক দিব কেন? আমরাই যাইব।”

বড়রাণীরা আঁতুড়ঘরে গিয়াই শিকলে নাড়া দিলেন। অমনি রাজসভা ভাঙ্গিয়া, ঢাক- ঢোলের বাদ্য দিয়া, মণি - মাণিক হাতে ঠাকুর - পুরুত সাথে, রাজা আসিয়া দেখেন, —কিছুই না!

রাজা ফিরিয়া গেলেন।

রাজা সভায় বসিতে- না - বসিতেই আবার শিকলে নাড়া পড়িল।

রাজা আবার ছুটিয়া গেলেন। গিয়া দেখেন, এবারও কিছুই না। মনের কষ্টে রাজা রাগ করিয়া বলিলেন, —“ছেলে না হইতে আবার শিকল নাড়া দিলে, আমি সব রাণীকে কাটিয়া ফেলিব। ” বলিয়া রাজা চলিয়া গেলেন।

একে একে ছোটরাণীর সাতটি ছেলে একটি মেয়ে হইল। আহা, ছেলে- মেয়েগুলো যে—চাঁদের পুতুল —ফুলের কলি। আঁকুপাঁকু করিয়া হাত নাড়ে, পা নাড়ে, —আঁতুড়ঘরে আলো হইয়া গেল।

ছোটরাণী আস্তে আস্তে বলিলেন, —“দিদি, কি ছেলে হইল একবার দেখাইলি না!”

বড়রাণীরা ছোটরাণীর মুখের কাছে রঙ্গ- ভঙ্গী করিয়া হাত নাড়িয়া, নথ নাড়িয়া, বলিয়া উঠিল, —“ছেলে না, হাতী হইয়াছে, —ওঁর আবার ছেলে হইবে! —ক’টা ইঁদুর আর ক’টা কাঁকড়া হইয়াছে।”

শুনিয়া ছোটরাণী অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া রহিলেন।

নিষ্ঠুর বড়রাণীরা আর শিকলে নাড়া দিল না। চুপি- চুপি হাঁড়ি - সরা আনিয়া ছেলেমেয়েগুলোকে তাহাতে পুরিয়া, পাঁশ - গাদায় পুঁতিয়া ফেলিয়া আসিল। আসিয়া, তাহার পর শিকল ধরিয়া টান দিল।

রাজা আবার ঢাক- ঢোলের বাদ্য দিয়া, মণি - মাণিক হাতে ঠাকুর - পুরুত সাথে আসিলেন; —বড়রাণীরা হাত মুছিয়া, মুখ মুছিয়া তাড়াতাড়ি করিয়া কতগুলি ব্যাঙের ছানা, ইঁদুরের ছানা আনিয়া দেখাইল।

দেখিয়া, রাজা আগুন হইয়া, ছোটরাণীকে রাজপুরীর বাহির করিয়া দিলেন।

বড়রাণীদের মুখে আর হাসি ধরে না; —পায়ের মলের বাজনা থামে না। সুখের কাঁটা দূর হইল; রাজপুরীতে আগুন দিয়া ঝগড়া- কোন্দল সৃষ্টি করিয়া ছয় রাণীকে মনে সুখে ঘরকন্না করিতে লাগিলেন।

পোড়াকপালী ছোটরাণীর দুঃখে গাছ- পাথর ফাটে, নদীনালা শুকায়— ছোটরাণী ঘুঁটেকুড়ানী দাসী হইয়া, পথে পথে ঘুরিতে লাগিলেন।

(২)

এমনি করিয়া দিন যায়। রাজার মনে সুখ নাই, রাজার রাজ্যে সুখ নাই, — রাজপুরী খাঁ- খাঁ করে, রাজার বাগানে ফুল ফোটে না, — রাজার পূজা হয় না।

একদিন, মালী আসিয়া বলিল —“মহারাজ, নিত্য পূজার ফুল পাই না, আজ যে, পাঁশগাদার উপরে, সাত চাঁপা এক পারুল গাছে, টুলটুলে সাত চাঁপা আর এক পারুল ফুটিয়া রহিয়াছে।”

রাজা বলিলেন, —“তবে সেই ফুল আন, পূজা করিব।”

মালী ফুল আনিতে গেল।

মালীকে দেখিয়া পারুলগাছে পারুলফুল চাঁপাফুলদিগে ডাকিয়া বলিল, —

“সাত ভাই চম্পা জাগ রে!”

অমনি সাত চাঁপা নড়িয়া উঠিয়া সাড়া দিল, —

“কেন বোন্, পারুল ডাক রে।”

পারুল বলিল, —

“ রাজার মালী এসেছে,
পূজার ফুল দিবে কি না দিবে? ”

সাত চাঁপা তুরতুর করিয়া উপর উঠিয়া গিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিতে লাগিল, —

“ না দিব, না দিব ফুল উঠিব শতেক দূর,
আগে আসুক রাজা, তবে দিব ফুল! ”

দেখিয়া শুনিয়া মালী অবাক হইয়া গেল। ফুলের সাজি ফেলিয়া, দৌড়িয়া গিয়া, রাজার কাছে খবর দিল।

আশ্চর্য হইয়া, রাজা, রাজসভার সকলে সেইখানে আসিলেন।

(৩)

রাজা আসিয়া ফুল তুলিতে গেলেন, অমনি পারুল ফুল চাঁপা ফুলদিগকে ডাকিয়া বলিল, —

“সাত ভাই চম্পা জাগ রে! ”

চাঁপারা উত্তর দিল, —

“কেন বোন্ পারুল ডাক রে?”

পারুল বলিল, —

"রাজা আপনি এসেছেন,
ফুল দিবে কি না দিবে?

চাঁপারা বলিল, —

" না দিব, না দিব ফুল, উঠিব শতেক দূর,
আগে আসুক রাজার বড় রাণী
তবে দিব ফুল।"

বলিয়া, চাঁপাফুলেরা আরও উঁচুতে উঠিল।

রাজা বড়রাণীকে ডাকাইলেন। বড়রাণী, মল বাজাইতে বাজাইতে আসিয়া ফুল তুলিতে গেল। চাঁপাফুলেরা বলিল, —

"না দিব , না দিব ফুল , উঠিব শতেক দূর ,
আগে আসুক রাজার মেজরাণী , তবে দিব ফুল। "

তাহার পর মেজ- রাণী আসিলেন, সেজ- রাণী আসিলেন, ন- রাণী আসিলেন, কনে- রাণী আসিলেন, কেহই ফুল পাইলেন না। ফুলেরা গিয়া আকাশে তারার মত ফুটিয়া রহিল।

রাজা গালে হাত দিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িলেন।

শেষে দুয়োরাণী আসিলেন; তখন ফুলেরা বলিল, —

"না দিব, না দিব ফুল, উঠিব শতেক দূর,
যদি আসে রাজার ঘুঁটে- কুড়ানী দাসী,
তবে দিব ফুল।"

তখন খোঁজ- খোঁজ পড়িয়া গেল। রাজা চৌদোলা পাঠাইয়া দিলেন, পাইক বেহারারা চৌদোলা লইয়া মাঠে গিয়া ঘুঁটে - কুড়ানী দাসী ছোটরাণীকে লইয়া আসিল।

ছোটরাণীর হাতে পায়ে গোবর, পরনে ছেড়া কাপড়, তাই লইয়া তিনি ফুল তুলিতে গেলেন। অমনি সুরসুর করিয়া চাঁপারা আকাশ হইতে নামিয়া আসিল, পারুল ফুলটি গিয়া তাদের সঙ্গে মিশিল; ফুলের মধ্য হইতে সুন্দর সুন্দর চাঁদের মত সাত রাজপুত্র এক রাজকন্যা "মা মা" বলিয়া ডাকিয়া, ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া ঘুঁটে- কুড়ানী দাসী ছোটরাণীর কোলে - কাঁখে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

সকলে অবাক্! রাজার চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল গড়াইয়া গেল। বড়রাণীরা ভয়ে কাঁপিতে লাগিল।

রাজা তখনি বড়রাণীদিগে হেঁটে কাঁটা উপরে কাঁটা দিয়া পুঁতিয়া ফেলিতে আজ্ঞা দিয়া, সাত- রাজপুত্র, পারুল, মেয়ে আর ছোটরাণীকে লইয়া রাজপুরীতে গেলেন।

রাজপুরীতে জয়ডঙ্কা বাজিয়া উঠিল।

শীত বসন্ত

(১)

এক রাজার দুই রাণী, সুয়োরাণী আর দুয়োরাণী। সুয়োরাণী যে, নুনটুকু ঊন হইতেই নখের আগায় আঁচড় কাটিয়া, ঘর-কন্নায় ভাগ বাঁটিয়া সতীনকে একপাশ করিয়া দেয়। দুঃখে দুয়োরাণীর দিন কাটে।

সুয়োরাণীর ছেলে- পিলে হয় না। দুয়োরাণীর দুই ছেলে, —শীত আর বসন্ত। আহা, ছেলে নিয়া দুয়োরাণীর যে যন্ত্রণা! —রাজার রাজপুত্র, সৎ- মায়ের গঞ্জনা খাইতে- খাইতে দিন যায়।

একদিন নদীর ঘাটে স্নান করিতে গিয়া সুয়োরাণী দুয়োরাণীকে ডাকিয়া বলিল—"আয় তো, তোর মাথায় ক্ষার খৈল দিয়া দি।" ক্ষার খৈল দিতে- দিতে সুয়োরাণী চুপ করিয়া দুয়োরাণীর মাথায় এক ওষুধের বড়ি টিপিয়া দিল। দুঃখিনী দুয়োরাণী টিয়া হইয়া "টি, টি" করিতে- করিতে উড়িয়া গেল।

বাড়ি আসিয়া সুয়োরাণী বলিল, —"দুয়োরাণী তো জলে ডুবিয়া মরিয়াছে!"

রাজা তাহাই বিশ্বাস করিলেন।

রাজপুরীর লক্ষ্মী গেল, রাজপুরী আঁধার হইল; মা- হারা শীত- বসন্তের দুঃখের সীমা রহিল না।

টিয়া হইয়া দুঃখিনী দুয়োরাণী উড়িতে উড়িতে আর এক রাজার রাজ্যে গিয়া পড়িলেন। রাজা দেখেন, সোনার টিয়া। রাজার এক টুকটুকে মেয়ে, সেই মেয়ে বলিল, —“বাবা, আমি সোনার টিয়া নিব।”

টিয়া, দুয়োরাণী রাজকন্যার কাছে সোনার পিঞ্জরে রহিলেন।

(২)

দিন যায়, বছর যায়, সুয়োরাণীর তিন ছেলে হইল। ও মা! এক-এক ছেলে যে, বাঁশের পাতা —পাট-কাটি, ফুঁ দিলে উড়ে, ছুঁইতে গেলে মরে। সুয়োরাণী কাঁদিয়া কাটিয়া রাজ্য ভাসাইল।

পাট-কাটি তিন ছেলে নিয়া সুয়োরাণী গুমরে গুমরে আগুনে পুড়িয়া ঘর করে। মন- ভরা জ্বালা, পেট- ভরা হিংসা, —আপনার ছেলেদের থালে পাঁচ পরমান্ন অষ্টরন্ধন, ঘিয়ে চপ্ চপ্ পঞ্চব্যঞ্জন সাজাইয়া দেন; শীত বসন্তের পাতে আলুন আতেল কড়কড়া ভাত সড়সড়া চাল শাকের উপর ছাইয়ের তাল ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যান।

সতীন তো ‘উরী পুরী দক্ষিণ- দু’রী, ’— সতীনের ছেলে দুইটা যে, নাদুস- নুদুস্—আর তাঁহার তিন ছেলে পাট- কাটি! হিংসায় রাণীর মুখে অন্ন রুচে না, নিশিতে নিদ্রা হয় না।

রাণী তে- পথের ধূলা এলাইয়া, তিন কোণের কুটা জ্বালাইয়া, বাসি উনুনের ছাই দিয়া, ভাঙ্গা- কুলায় করিয়া সতীনের ছেলের নামে ভাসাইয়া দিল।

কিছুতেই কিছু হইল না।

শেষে, একদিন শীত বসন্ত পাঠশালায় গিয়াছে; কিছুই জানে না, শোনে না, বাড়িতে আসিতেই রণমূর্তি সৎ- মা তাহাদিগে গালিমন্দ দিয়া খেদাইয়া দিল!

রণমূর্তি সৎ-মা গালি-মন্দ দিয়া খেদাইয়া দিল

তাহার পর রাণী, বাঁশ-পাতা ছেলে তিনটাকে আছাড় মারিয়া থুইয়া, উথাল পাতাল করিয়া এ জিনিস ভাঙ্গে ও জিনিস চুরে; আপন মাথার চুল ছিঁড়ে, গায়ের আভরণ ছুঁড়িয়া মারে।

দাসী, বাঁদী, গিয়া রাজাকে খবর দিল!

'সুয়োরাণীর ডরে
থর্ থর্ থর্ করে —'

রাজা আসিয়া বলিলেন, —"এ কি!"

রাণী বলিল, —" কি! সতীনের ছেলে, সেই আমাকে গা'লমন্দ দিল। শীত- বসন্তের রক্ত নহিলে আমি নাইব না! "

অমনি রাজা জল্লাদকে ডাকিয়া আজ্ঞা দিলেন, –"শীত-বসন্তকে কাটিয়া রাণীকে রক্ত আনিয়া দাও। "

শীত-বসন্তের চোখের জল কে দেখে! জল্লাদ শীত-বসন্তকে বাঁধিয়া নিয়া গেল।

(৩)

এক বনের মধ্যে আনিয়া জল্লাদ, শীত- বসন্তের রাজ - পোষাক খুলিয়া, বাকল পরাইয়া দিল।

শীত বলিলেন, —" ভাই, কপালে এই ছিল! "

বসন্ত বলিলেন, —"দাদা, আমরা কোথায় যাব? "

কাঁদিতে কাঁদিতে শীত বলিলেন, —"ভাই, চল, এতদিন পরে আমরা মা' র কাছে যাব। "

খড়্গ নামাইয়া রাখিয়া দুই রাজপুত্রের বাঁধন খুলিয়া দিয়া, ছলছল চোখে জল্লাদ বলিল, —"রাজপুত্র! রাজার আজ্ঞা, কি করিব— কোলে- কাঁখে করিয়া মানুষ করিয়াছি, সেই সোনার অঙ্গে আজ কি না খড়্গ ছোঁয়াইতে হইবে ! —আমি তা' পারিব না রাজপুত্র।—আমার কপালে যা' থাকে থাকুক, এ বাকল চাদর পরিয়া বনের পথে চলিয়া যাও, কেহ আর রাজপুত্র বলিয়া চিনিতে পারিবে না।"

বলিয়া, শীত বসন্তকে পথ দেখাইয়া দিয়া, দুইটা শিয়াল-কুকুর কাটিয়া, জল্লাদ, রক্ত নিয়া রাণীকে দিল।

রাণী সেই রক্ত দিয়া স্নান করিলেন; খিল্- খিল করিয়া হাসিয়া আপনার তিন ছেলে কোলে, পাঁচ পাত সাজাইয়া খাইতে বসিলেন।

(৪)

শীত বসন্ত দুই ভাই চলেন, চলেন, বন আর ফুরায় না। শেষে, দুই ভাইয়ে এক গাছের তলায় বসিলেন।

বসন্ত বলিলেন, —“দাদা, বড় তৃষ্ণা পাইয়াছে, জল কোথায় পাই? ”

শীত বলিলেন, —“ ভাই, এত পথ আসিলাম, জল তো কোথাও দেখিলাম না! আচ্ছা, তুমি বস, আমি জল দেখিয়া আসি। ”

বসন্ত বসিয়া রহিল, শীত জল আনিতে গেলেন।

যাইতে, যাইতে, অনেক দূরে গিয়া, শীত বনের মধ্যে এক সরোবর দেখিতে পাইলেন। জলের তৃষ্ণায় বসন্ত না- জানি কেমন করিতেছে, —কিন্তু কিসে করিয়া জল নিবেন? তখন, গায়ের যে চাদর, সেই চাদর খুলিয়া, শীত সরোবরে নামিলেন।

সেই দেশের যে রাজা, মারা গিয়াছেন। রাজার ছেলে নাই, পুত্র নাই, রাজসিংহাসন খালি পড়িয়া আছে। রাজ্যের লোকজনে শ্বেত রাজহাতীর পিঠে পাটসিংহাসন উঠাইয়া দিয়া হাতী ছাড়িয়া দিল। হাতী যাহার কপালে রাজটিকা দেখিবে, তাহাকেই রাজসিংহাসনে উঠায়াই দিয়া আসিবে, সে- ই রাজ্যের রাজা

হইবে।

রাজসিংহাসন পিঠে শ্বেত রাজহাতী, পৃথিবী ঘুরিয়া কাহারও কপালে রাজটিকা দেখিল না। শেষে ছুটিতে ছুটিতে, যে বনে শীত বসন্ত, সেই বনে, আসিয়া দেখে, এক রাজপুত্র গায়ের চাদর ভিজাইয়া সরোবরে জল নিতেছে।—রাজপুত্রের কপালে রাজটিকা। দেখিয়া, শ্বেত রাজহাতী অমনি শুঁড় বাড়াইয়া শীতকে ধরিয়া সিংহাসনে তুলিয়া নিল।"

শ্বেত রাজ-হাতী

** হাতী শুঁড় বাড়াইয়া শীতকে ধরিয়া সিংহাসনে তুলিয়া নিল **

"ভাই বসন্ত, ভাই বসন্ত, "করিয়া শীত কত কাঁদিলেন। হাতী কি তাহা মানে? বন-জঙ্গল ভাঙ্গিয়া, পাট- হাতী শীতকে পিঠে করিয়া ছুটিয়া গেল।

(৫)

জল আনিতে গেল, দাদা আর ফিরে না। বসন্ত উঠিয়া সকল বন খুঁজিয়া, " দাদা, দাদা " বলিয়া ডাকিয়া খুন হইল। দাদাকে যে

হাতীতে নিয়াছে, বসন্ত তো তাহা জানে না; বসন্ত কাঁদিয়া কাঁদিয়া সারা হইল। শেষে, দিন গেল, বিকাল গেল, সন্ধ্যা গেল, রাত্রি হইল; তৃষ্ণায় ক্ষুধায় অস্থির হইয়া, দাদাকে হারাইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বসন্ত এক গাছের তলায় ধূলা- মাটিতে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

দুঃখিনী মায়ের বুকের মাণিক ছাই- পাঁশে গড়াগড়ি গেল !

খুব ভোরে, এক মুনি, জপ- তপ করিবেন, জল আনিতে সরোবরে যাইতে, দেখেন, কোন্ এক পরম সুন্দর রাজপুত্র গাছের তলায় ধূলা- মাটিতে পড়িয়া আছে। দেখিয়া, মুনি বসন্তকে বুকে করিয়া তুলিয়া নিয়া গেলেন।

(৬)

শ্বেত রাজহাতীর পিঠে শীত তো সেই নাই- রাজার রাজ্যে গেলেন! যাইতেই, রাজ্যের যত লোক আসিয়া মাটিতে মাথা ছোঁয়াইল, মন্ত্রী, অমাত্য, সিপাইসান্ত্রীরা সকলে আসিয়া মাথা নোয়াইল, নোয়াইয়া সকলে রাজসিংহাসনে তুলিয়া নিয়া শীতকে রাজা করিল।

প্রাণের ভাই বসন্ত, সেই বসন্ত বা কোথায়, শীত বা কোথায়! দুঃখিনী মায়ের দুই মাণিক বোঁটা ছিঁড়িয়া দুই খানে পড়িল।

রাজা হইয়া শীত, ধন- রত্ন, মণি - মাণিক্য, হাতী - ঘোড়া, সিপাই - লস্কর লইয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন। আজ এ - রাজাকে হারাইয়া দিয়া তাহার রাজ্য নেন, কাল ও - রাজাকে

হারাইয়া দিয়া তাহার রাজ্য আনেন, আজ মৃগয়া করেন, কাল দিগ্বিজয়ে যান, —এই রকমে দিন যায়!

মুনির কাছে আসিয়া বসন্ত, গাছের ফল খায়, সরোবরের জলে নায়, দায়, থাকে। মুনি চারিপাশে আগুন করিয়া বসিয়া থাকেন, কতদিন কাঠ- কুটা ফুড়াইয়া যায়, —বসন্তের পরনে বাকল, হাতে নড়ি, বনে বনে ঘুরিয়া কাঠ- কুটা কুড়াইয়া, মুনির জন্য বহিয়া আনে।

তাহার পর বসন্ত বনের ফুল তুলিয়া মুনির কুটীর সাজায় আর সারাদিন ভরিয়া ফুলের মধু খায়।

তাহার পর, সন্ধ্যা হইতে- না- হইতে, বনের পাখি সব একখানে হয়, আপন- আপন বাসায় যায়, বসন্ত মুনির পাশে বসিয়া কত শাস্ত্রের কথা, কত মন্ত্রের কথা এইসব শোনে। এইভাবে দিন যায়।

রাজসিংহাসনে শীত আপন রাজ্য লইয়া, বনের বসন্ত আপন বন লইয়া; — দিনে দিনে পলে পলে কাহারও কথা কাহারও মনে থাকিল না।

কাঠ-কুটা বহিয়া আনে

(৭)

তিন রাত যাইতে- না - যাইতে সুয়োরাণীর পাপে রাজার সিংহাসন কাঁপিয়া উঠিল; —দিন যাইতে- না - যাইতে রাজার রাজ্য গেল। রাজপাট গেল। সকল হারাইয়া, খোয়াইয়া, রাজা আর সুয়োরাণীর মুখ দেখিলেন না; রাজা বনবাসে গেলেন।

সুয়োরাণীর যে, সাজা! ছেলে তিনটা সঙ্গে, এক নেকড়া পরনে এক নেকড়া গায়ে, এ দুয়ারে যায় —“ দূর, দূর! ” ও দুয়ারে যায়—“ ছেই, ছেই!! ” তিন ছেলে নিয়া সুয়োরাণী চক্ষের জলে ভাসিয়া পথে পথে ঘুরিতে লাগিলেন।

ঘুরিতে ঘুরিতে সুয়োরাণী সমুদ্রের কিনারে গেলেন। —আর সাত সমুদ্রের ঢেউ আসিয়া চক্ষের পলকে সুয়োরাণীর তিন ছেলেকে ভাসাইয়া নিয়া গেল। সুয়োরাণী কাঁদিয়া আকাশ ফাটাইল; বুকে চাপড়, কপালে চাপড় দিয়া, শোকে দুঃখে পাগল হইয়া মাথায় পাষাণ মারিয়া, সুয়োরাণী সকল জ্বালা এড়াইল। সুয়োরাণীর জন্য পিঁপড়াটিও কাঁদিল না, কুটাটুকুও নড়িল না; —সাত সমুদ্রের জল সাত দিনের পথে সরিয়া গেল। কোথায় বা সুয়োরাণী, কোথায় বা তিন ছেলে —কোথাও কিছু রহিল না।

(৮)

সেই যে সোনার টিয়া—সেই যে রাজার মেয়ে! সেই রাজকন্যার যে স্বয়ম্বর। কত ধন, কত দৌলত, কত কি লইয়া কত দেশের কত

রাজপুত্র আসিয়াছেন। সভা করিয়া সকলে বসিয়া আছেন, এখনো রাজকন্যার বা'র নাই।

রূপবতী রাজকন্যা আপন ঘরে সিঁথিপাটি কাটিয়া, আলতা কাজল পরিয়া, সোনার টিয়াকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, —

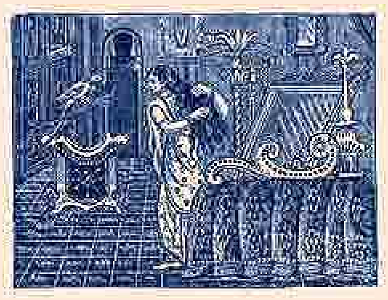

"সোনার টিয়া, বল্ তো আমার আর কি চাই?"

"সোনার টিয়া, বল্ তো
আমার আর কি চাই?"

টিয়া বলিল, —

"সাজতো ভাল কন্যা, যদি
সোনার নূপুর পাই!"

রাজকন্যা কৌটা খুলিয়া সোনার নূপুর বাহির করিয়া পায়ে দিলেন। সোনার নূপুর রাজকন্যার পায়ে রুণু ঝুণু করিয়া বাজিয়া উঠিল!

রাজকন্যা বলিলেন, —

"সোনার টিয়া, বল্ তো আমার আর কি চাই?"

টিয়া বলিল, —

"সাজতো ভাল কন্যা, যদি ময়ূরপেখম পাই!"

রাজকন্যা পেঁটরা আনিয়া ময়ূরপেখম শাড়ি খুলিয়া পরিলেন। শাড়ির রঙে ঘর উজ্জ্বল, শাড়ির শোভায়, রাজকন্যার মত উতল। মুখখানা ভার করিয়া টিয়া বলিল, —

"রাজকন্যা, রাজকন্যা, কিসের গরব কর; —
শতেক নহর হীরার হার গলায় না পর!"

রাজকন্যা শতেক নহর হীরার হার গলায় দিলেন। শতেক নহরের শতেক হীরা ঝক্- ঝক্ করিয়া উঠিল!

টিয়া বলিল, —

"শতেক নহর ছাই!
নাকে ফুল কানে দুল
সিঁথির মাণিক চাই !"

রাজকন্যা নাকে মোতির ফুলের নোলক পরিলেন; সিঁথিতে মণি-মাণিক্যের সিঁথি পরিলেন।

তখন রাজকন্যার টিয়া বলিল, —

"রাজকন্যা রূপবতী নাম থুয়েছে মায়।
গজমোতি হ'ত শোভা ষোল- কলায়।
না আনিল গজমোতি, কেমন এল বর?
রাজকন্যা রূপবতী ছাইয়ের স্বয়ম্বর !"

শুনিয়া, রূপবতী রাজকন্যা গায়ের আভরণ, পায়ের নূপুর, ময়ূরপেখম, কানের দুল ছুঁড়িয়া, ছিঁড়িয়া, মাটিতে, লুটাইয়া পড়িলেন। কিসের স্বয়ম্বর, কিসের কি!

রাজপুত্রদের সভায় খবর গেল, রাজকন্যা রূপবতী স্বয়ম্বর করিবেন না; রাজকন্যার পণ, যে রাজপুত্র গজমোতি আনিয়া দিতে পারিবেন, রাজকন্যা তাঁহার হইবেন —না পারিলে রাজকন্যার নফর থাকিতে হইবে।

সকল রাজপুত্র গজমোতির সন্ধানে বাহির হইলেন।

কত রাজ্যের কত হাতী আসিল, কত হাতীর মাথা কাটা গেল—যে- সে হাতীতে কি গজমোতি থাকে? গজমোতি পাওয়া গেল না।

রাজপুত্রেরা শুনিলেন,

সমুদ্রের কিনারে হাতী,
তাহার মাথায় গজমোতি।

সকল রাজপুত্রে মিলিয়া সমুদ্রের ধারে গেলেন।

সমুদ্রের ধারে যাইতে- না - যাইতেই একপাল হাতী আসিয়া অনেক রাজপুত্রকে মারিয়া ফেলিল, অনেক রাজপুত্রের হাত গেল, পা গেল।

গজমোতি কি মানুষে আনিতে পারে? রাজপুত্রেরা পলাইয়া আসিলেন।

আসিয়া রাজপুত্রেরা কি করেন —রূপবতী রাজকন্যা নফর হইয়া রহিলেন।

কথা শীতরাজার কানে গেল। শীত বলিলেন, —“কি! রাজকন্যার এত তেজ, রাজপুত্রদিগকে নফর করিয়া রাখে — রাজকন্যার রাজ্য আটক কর।”

রাজকন্যা শীতরাজার হাতে আটক হইয়া রহিলেন।

(৯)

আজ যায় কাল যায়, বসন্ত মুনির বনে থাকেন। পৃথিবীর খবর বসন্তের কাছে যায় না, বসন্তের খবর পৃথিবী পায় না।

মুনির পাতার কুঁড়ে; পাতার কুঁড়েতে এক শুক আর এক সারী থাকে।

একদিন শুক কয়, —

“সারী, সারী! বড় শীত !”

সারী বলে, —

“গায়ের বসন টেনে দিস!”

শুক বলে, —

"বসন গেল ছিঁড়ে, শীত গেল দূরে,
কোনখানে, সারি, ন- দীর কূল?"

সারী উত্তর করিল, —

"দুধমুকু -টে' ধবল পাহাড় ক্ষীরসাগরের পাড়ে -,
গজমোতির রাঙা আলো ঝরঝরিয়ে পড়ে।
আলোর তলে পদ্ম -পাতে খেলে দুধের জল,
হাজার হাজার ফুটে আছে সোনার কমল -।"

শুক কহিল, —

"সেই সোনার কমল, সেই গজমোতি
কে আনবে তুলে' কে পাবে রূপবতী!"

শুনিয়া বসন্ত বলিলেন, —

"শুক সারী মেসো মাসী
কি বল্‌ছিস্‌ বল্‌,
আমি আনবো গজমোতি
সোনার কমল।"

শুক সারী বলিল, —"আহা বাছা, পারিবি?"

বসন্ত বলিলেন, —"পারিব না তো কি!"

শুক বলিল, —"তবে, মুনির কাছে গিয়া ত্রিশূলটা চা!"

সারী বলিল,— "শিমূল গাছে কাপড়- চোপড় আছে,
মুকুট আছে, তা'ই নিয়া যা।"

বসন্ত মুনির কাছে গেল। গিয়া বলিল, —"বাবা, আমি গজমোতির আর সোনার কমল আনিব, ত্রিশূলটা দাও।"

মুনি ত্রিশূল দিলেন।

মুনির পায়ে প্রণাম করিয়া, ত্রিশূল হাতে বসন্ত শিমূল গাছের কাছে গেলেন। গিয়া দেখেন, শিমুল গাছে কাপড়- চোপড়, শিমুল গাছে রাজমুকুট। বসন্ত বলিলেন, —" হে বৃক্ষ, যদি সত্যকারের বৃক্ষ হও তো, তোমার কাপড়- চোপড় আর তোমার রাজমুকুট আমাকে দাও। "

বৃক্ষ বসন্তকে কাপড়- চোপড় আর রাজমুকুট দিল। বসন্ত বাকল ছাড়িয়া কাপড় - চোপড় পরিলেন; রাজমুকুট মাথায় দিলেন। দিয়া, বসন্ত, ক্ষীর - সাগরের উদ্দেশে চলিতে লাগিলেন।

যাইতে, যাইতে, যাইতে, বসন্ত কত পর্বত কত বন, কত দেশ- বিদেশ ছাড়াইয়া বার বচ্ছর তের দিনে 'দুধ- মুকুটে' ধবল পাহাড়ের কাছে গিয়া পৌঁছিলেন। ধবল পাহাড়ের মাথায় দুধের সর থক্ থক্, ধবল পাহাড়ের গায়ে দুধের ঝরণা ঝর্ ঝর্ ; বসন্ত সেই পাহাড়ে উঠিলেন।

উঠিয়া দেখেন, ধবল পাহাড়ের নীচে ক্ষীরের সাগর —

ক্ষীর- সাগরে ক্ষীরের ঢেউ ঢল ঢল করে —
লক্ষ হাজার পদ্মফুল ফুটে আছে থরে।
ঢেউ থই থই সোনার কমল, তা 'রি মাঝে কি? —
দুধের বরণ হাতীর মাথে —গজমোতি!

বসন্ত দেখিলেন, চারিদিকে পদ্মফুলের মধ্যে দুধবরণ হাতী দুধের জল ছিটাইয়া খেলা করিতেছে —সেই হাতীর মাতায় গজমোতি।- সোনার মতন মণির মতন, হীরার মতন গজমোতির জ্বলজ্বলে আলো ঝর্ ঝর্ করিয়া পড়িতেছে। গজমোতির আলোতে ক্ষীর- সাগরে হাজার চাঁদের মেলা, পদ্মের বনে পাতে পাতে সোনার কিরণ খেলা। দেখিয়া, বসন্ত অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

তখন, বসন্ত, কাপড়-চোপড় কষিয়া, হাতের ত্রিশূল আঁটিয়া ধবল পাহাড়ের উপর হইতে ঝাঁপ দিয়া গজমোতির উপরে পড়িলেন।

গজমোতি

অমনি ক্ষীর- সাগর শুকাইয়া গেল, পদ্মের বন শুকাইয়া গেল; দুধ - বরণ হাতী এক সোনার পদ্ম হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, —

"কোন্ দেশের রাজপুত্র কোন্ দেশে ঘর? "

বসন্ত বলিলেন, —
"বনে বনে বাস, আমি মুনির কোঙর। "

পদ্ম বলিল, —“ মাথে রাখ গজমোতি, সোনার কমল বুকে,
রাজকন্যা রূপবতী ঘর করুক সুখে! ”

বসন্ত সোনার পদ্ম তুলিয়া বুকে রাখিলেন, গজমোতি তুলিয়া মাথায় রাখিলেন। রাখিয়া, ক্ষীর- সাগরের বালুর উপর দিয়া বসন্ত দেশে চলিলেন।

অমনি ক্ষীর- সাগরের বালুর তলে কাহারা বলিয়া উঠিল, —“ ভাই, ভাই! আমাদিগে নিয়া যাও। ”

বসন্ত ত্রিশূল দিয়া বালু খুঁড়িয়া দেখেন, তিন যে সোনার মাছ! তিন সোনার মাছ লইয়া বসন্ত চলিতে লাগিলেন।

বসন্ত যেখান দিয়া যান, গজমোতির আলোতে দেশ উজল হইয়া ওঠে। লোকেরা বলে, —“দেখ, দেখ, দেবতা যায়! ”

বসন্ত চলিতে লাগিলেন।

(১০)

শীত রাজা মৃগয়ায় বাহির হইয়াছেন। সকল রাজ্যের বন খুঁজিয়া, একটা হরিণ যে, তাহাও পাওয়া গেল না। শীত সৈন্য- সামন্তের হাতেঘোড়া দিয়া এক গাছতলায় আসিয়া বসিলেন।

গাছতলায় বসিতেই শীতের গায়ে কাঁটা দিল। শীত দেখিলেন, এই তো সেই গাছ! এই গাছের তলায় জল্লাদের কাছ হইতে বনবাসী

দুই ভাই আসিয়া বসিয়াছিলেন, ভাই বসন্ত জল চাহিয়াছিল, শীত জল আনিতে গিয়াছিলেন। সব কথা শীতের মনে হইল, —রাজমুকুট ফেলিয়া দিয়া, খাপ তরোয়াল ছুঁড়িয়া দিয়া, শীত, "ভাই বসন্ত!" "ভাই বসন্ত!" করিয়া ধূলার লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

সৈন্য- সামন্তেরা দেখিয়া অবাক! তাহারা দোল চৌদাল আনিয়া রাজাকে তুলিয়া রাজ্যে লইয়া গেল।

(১১)

গজমোতির আলোতে দেশ উজল করিতে করিতে বসন্ত রূপবতী রাজকন্যার দেশে আসিলেন।

রাজ্যের লোক ছুটিয়া আসিল, —"দেখ, দেখ, কে আসিয়াছেন!"

বসন্ত বলিলেন, —"আমি বসন্ত, 'গজমোতি' আনিয়াছি।"

রাজ্যের লোক কাঁদিয়া বলিল, —"এক দেশের শীতরাজা রাজকন্যাকে আটক করিয়া রাখিয়াছেন।

শুনিয়া, বসন্ত শীতরাজার রাজ্যে গিয়া, তিন সোনার মাছ রাজাকে পাঠাইয়া দিয়া বলিলেন—"রূপবতী রাজকন্যার রাজ্যের দুয়ার খুলিয়া দিতে আজ্ঞা হউক!"

সকলে বলিলেন—"দেবতা, গজমোতি আনিয়াছেন। তা, রাজা আমাদের ভাইয়ের শোকে পাগল; সাত দিন সাত রাত্রি না গেলে তো দুয়ার খুলিবে না।" ত্রিশূল হাতে, গজমোতি মাথায় বসন্ত, দুয়ার আলো করিয়া সাত দিন সাত রাত্রি বসিয়া রহিলেন।

আট দিনের দিন রাজা একটু ভাল হইয়াছেন, দাসী গিয়া সোনার মাছ কুটিতে বসিল। অমনি মাছেরা বলিল, —

আঁশে ছাই, চোখে ছাই,
কেটো না কেটো না মাসি, রাজা মোদের ভাই!"

"রাজা মোদের ভাই"

দাসী ভয়ে বটি-মটি ফেলিয়া, রাজার কাছে গিয়া খবর দিল।

রাজা বলিলেন, —"কৈ কৈসোনার মাছ কৈ !?
সোনার মাছ যে এনেছে সে মানুষ কৈ?"

রাজা সোনার মাছ নিয়া পড়িতে-পড়িতে ছুটিয়া বসন্তের কাছে গেলেন।

দেখিয়া বসন্ত বলিলেন, —"দাদা!

শীত বলিলেন, —"ভাই!"

হাত হইতে সোনার মাছ পড়িয়া গেল; শীত, বসন্তের গলা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। দুই ভাইয়ের চোখের জল দর দর করিয়া বহিয়া গেল।

শীত বলিলেন, —“ ভাই, সুয়ো- মার জন্যে দুই ভাইয়ের এতকাল ছাড়াছাড়ি।”—

“মায়ের অপরাধ ভুলিয়া যান”

তিন সোনার মাছ তিন রাজপুত্র হইয়া, শীত বসন্তের পায়ে প্রণাম করিয়া বলিল, — “ দাদা, আমরাই অভাগী সুয়োরাণীর তিন ছেলে; আমাদের মুখ চাহিয়া মায়ের অপরাধ ভুলিয়া যান। ”

শীত বসন্ত, তিন ভাইকে বুকে লইয়া বলিলেন, —“সে কি ভাই, তোরা এমন হইয়া ছিলি! সুয়ো - মা কেমন, বাবা কেমন?”

তিন ভাই বলিল, —“ সে কথা আর কি বলিব, —বাবা বনবাসে, মা মরিয়া গিয়াছেন; তিন ভাই ক্ষীর- সমুদ্রের তলে সোনার মাছ হইয়া ছিলাম।”

শুনিয়া শীত- বসন্তের বুক ফাটিল; চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে গলাগলি পাঁচ ভাই রাজপুরী গেলেন।

(১২)

রাজকন্যার সোনার টিয়া পিঞ্জরে ঘোরে, ঘোরে আর কেবলি কয়—

"দুখিনীর ধন
সাত সমুদ্র ছেঁচে' এনেছে মাণিক রতন!"

রাজকন্যা বলিলেন—

"কি হয়েছে, কি হয়েছে আমার সোনার টিয়া!"

টিয়া বলিল—"যাদু আমার এল, কন্যা, গজমোতি নিয়া!"

সত্য সত্যই; দাসী আসিয়া খবর দিল, শীত রাজার ভাই রাজপুত্র যে, গজমোতি আনিয়াছেন!

শুনিয়া রাজকন্যা রূপবতী হাসিয়া টিয়ার ঠোঁটে চুমু খাইলেন। রাজকন্যা বলিলেন, —"দাসী লো দাসী, কপিলা গাইয়ের দুধ আন্, কাঁচা হলুদ বাটিয়া আন্; আমার সোনার টিয়াকে নাওয়াইয়া দিব!"

দাসীরা দুধ- হলুদ আনিয়া দিল। রাজকন্যা সোনা রূপার পিঁড়ি, পাট কাপড়ের গামছা, নিয়া, টিয়াকে স্নান করাইতে বসিলেন।

হলুদ দিয়া নাওয়াইতে- নাওয়াইতে রাজকন্যার আঙ্গুলে লাগিয়া টিয়ার মাথার ওষুধ- বড়ি খসিয়া পড়িল। —অমনি চারিদিকে আলো হইল, টিয়ার অঙ্গ ছাড়িয়া দুয়োরাণী দুয়োরাণী হইলেন।

মানুষ হইয়া দুয়োরাণী রাজকন্যাকে বুকে সাপটিয়া বলিলেন, —"রূপবতী মা আমার! তোরি জন্যে আমার জীবন পাইলাম।" থতমত খাইয়া রাজকন্যা রাণীর কোলে মাথা গুঁজিলেন।

রাজকন্যা বলিলেন, –" মা, আমার বড় ভয় করে, তুমি পরী, না, দেবতা, এতদিন টিয়া হইয়া আমার কাছে ছিলে? "

রাণী বলিলেন, —"রাজকন্যা, শীত আমার ছেলে, গজমোতি যে আনিয়াছে, সেই বসন্ত আমার ছেলে। "

শুনিয়া রাজকন্যা মাথা নামাইল।

(১৩)

পরদিন রূপবতী রাজকন্যা শীতরাজাকে বলিয়া পাঠাইলেন, —"দুয়ার খুলিয়া দিন, গজমোতি যিনি আনিয়াছেন তাঁহাকে গিয়া বরণ করিব।

"দুয়োরাণী দুয়োরাণী হইলেন"

রাজা দুয়ার খুলিয়া দিলেন।

বাদ্য- ভাণ্ড করিয়া রূপবতী রাজকন্যার পঞ্চ চৌদোলা শীতরাজার রাজ্যে পৌঁছিল। শীতরাজার রাজদুয়ারে ডঙ্কা বাজিল, রাজপুরীতে নিশান উড়িল, —রূপবতী রাজকন্যা বসন্তকে বরণ করিলেন।

শীত বলিলেন, —“ভাই, আমি তোমাকে পাইয়াছি, রাজ্য নিয়া কি করিব? রাজ্য তোমাকে দিলাম।” রাজপোষাক পরিয়া সোনার থালে গজমোতি রাখিয়া, বসন্ত, শীত, সকলে রাজসভায় বসিলেন। রাজকন্যার চৌদোলা আসিল। চৌদোলায় রঙবেরঙের আঁকন, ময়ূরপাখার ঢাকন্। ঢাকন্ খুলিতেই সকলে দেখে, ভিতরে, এক যে স্বর্গের দেবী, রাজকন্যা রূপবতীকে কোলে করিয়া বসিয়া আছেন!

রম্রমা সভা চুপ করিয়া গেল!

স্বর্গের দেবীর চোখে জল ছল্- ছল্, রাজকন্যাকে চুমু খাইয়া চোখের জলে ভাসিয়া স্বর্গের দেবী ডাকিলেন, —“আমার শীত বসন্ত কৈ রে!”

রাজসিংহাসন ফেলিয়া শীত উঠিয়া দেখেন, —**মা!** বসন্ত উঠিয়া দেখেন, —**মা!** সুয়োরাণীর ছেলেরা দেখেন, —এই তাঁহাদের **দুয়ো- মা** ! সকলে পড়িতে পড়িতে ছুটিয়া আসিলেন।

তখন রাজপুরীর সকলে একদিকে চোখের জল মোছে, আর একদিকে পুরী জুড়িয়া বাদ্য বাজে।

শীত বসন্ত বলিলেন, —“আহা, এ সময় বাবা আসিতেন, সুয়ো- মা থাকিতেন !” সুয়ো- মা মরিয়া গিয়াছে, সুয়ো - মা আর আসিল না; সকল শুনিয়া বনবাস ছাড়িয়া রাজা আসিয়া শীত বসন্তকে বুকে লইলেন।

তখন রাজার রাজ্য ফিরিয়া আসিল, সকল রাজ্য এক হইল, পুরী আলো করিয়া রাজকন্যার গলায় গজমোতি ঝল্- মল্ করিয়া

জ্বলিতে লাগিল। দুঃখিনী দুয়োরাণীর দুঃখ ঘুচিল। রাজা, দুয়োরাণী, শীত, বসন্ত, সুয়োরাণীর তিন ছেলে, রূপবতী রাজকন্যা —সকলে সুখে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

কিরণমালা

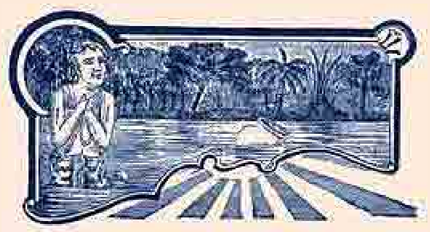

(১)

এক রাজা আর এক মন্ত্রী। একদিন রাজা মন্ত্রীকে বলিলেন, —“মন্ত্রী! রাজ্যের লোক সুখে আছে, কি, দুঃখে আছে, জানিলাম না!”

মন্ত্রী বলিলেন, —“মহারাজ! ভয়ে বলি, কি, নির্ভয়ে বলি?”

রাজা বলিলেন, —“নির্ভয়ে বল!”

তখন মন্ত্রী বলিলেন, —“মহারাজ, আগে- আগে রাজারা মৃগয়া করিতে যাইতেন, —দিনের বেলায় মৃগয়া করিতেন, রাত্রি হইলে ছদ্মবেশ ধরিয়া প্রজার সুখ- দুঃখ দেখিতেন। সে দিনও নাই সে কালও নাই, প্রজার নানা অবস্থা।”

শুনিয়া রাজা বলিলেন, –“এই কথা? কালই আমি মৃগয়ায় যাইব।”

(২)

রাজা মৃগয়া করিতে যাইবেন, রাজ্যে হুলুস্থূল পড়িল। হাতী সাজিল, ঘোড়া সাজিল, সিপাই সাজিল, মন্ত্রী সাজিল, সান্ত্রী সাজিল; পঞ্চকটক নিয়া, রাজা মৃগয়ায় গেলেন।

রাজার তো নামে মৃগয়া। দিনের বেলায় মৃগয়া করেন, —হাতীটা মারেন, বাঘটা মারেন; রাত হইলে রাজা ছদ্মবেশ ধরিয়া প্রজার সুখ- দুঃখ দেখেন।

একদিন রাজা এক গৃহস্থের বাড়ির পাশ দিয়া যান; শুনিতে পাইলেন, ঘরের মধ্যে গৃহস্থের তিন মেয়েতে কথাবার্তা বলিতেছে।

রাজা কান পাতিয়া রহিলেন।

বড় বোন বলিতেছে, —“দ্যাখ্ লো আমার যদি রাজবাড়ীর ঘেসেড়ার সঙ্গে বিয়ে হয়, তো আমি মনের সুখে কলাই- ভাজা খাই !”

তা’র ছোট বোন্ বলিল, —“আমার যদি রাজবাড়ীর সূপকারের (রাঁধুনে’র) সঙ্গে বিয়ে হয়, তো আমি সকলের আগে রাজভোগ খাই!”

সকলের ছোট বোন যে, সে আর কিছু কয় না; দুই বোন ধরিয়া বসিল—"কেন লো ছোট্টি! তুই যে কিছু বলিস না?"

ছোট্টি ছোট্ট করিয়া বলিল, —"নাঃ?"

দুই বোনে কি ছাড়ে? শেষে অনেকক্ষণ ভাবিয়া টাবিয়া ছোট বোন বলিল, —"আমার যদি রাজার সঙ্গে বিয়ে হইত, তো আমি রাণী হইতাম!"

সে কথা শুনিয়া দুই বোনে "হি!" "হি!" করিয়া উঠিল, —"ও মা, মা, পুঁটির যে সাধ!!"

শুনিয়া রাজা চলিয়া গেলেন

(৩)

পরদিন রাজা দোলা- চৌদোলা দিয়া পাইক পাঠাইয়া দিলেন, পাইক গিয়া গৃহস্থের তিন মেয়েকে নিয়া আসিল।

তিন বোন তো কাঁপিয়া কুঁপিয়া অস্থির। রাজা অভয় দিয়া বলিলেন, —"কাল রাত্রে কে কি বলিয়াছিলে বল তো?"

কেহ কিচ্ছু কয় না!

শেষে রাজা বলিলেন, —"সত্য কথা যদি না বল তো, বড়ই সাজা হইবে।"

তখন বড় বোন বলিল, —“আমি যে, এই বলিয়াছিলাম।” মেজো বোন বলিল, —“ আমি যে, এই বলিয়াছিলাম।” ছোট বোন তবু কিছু বলে না।

তখন রাজা বলিলেন, —“দেখ, আমি সব শুনিয়াছি। আচ্ছা তোমরা যে যা’ হইতে চাহিয়াছ, তাহাই করিব।”

তাহার পরদিনই রাজা তিন বোনের বড় বোনকে ঘেসেড়ার সঙ্গে বিবাহ দিলেন, মেজোটিকে সূপকারের সঙ্গে বিবাহ দিলেন, আর ছোটটিকে রাণী করিলেন।

তিন বোনের বড় বোন ঘেসেড়ার বাড়ি গিয়া মনের সাধে কলাইভাজা খায়; মেজো বোন রাজার পাকশালে সকলের আগে আগে রাজভোগ খায়, আর ছোট বোন রাণী হইয়া সুখে রাজসংসার করেন।

(৪)

কয়েক বছর যায়; রাণীর সন্তান হইবে। রাজা, রাণীর জন্য ‘হীরার ঝালর সোনার পাত, শ্বেতপাথরের নিগম ছাদ ’ দিয়া আঁতুড়ঘর বানাইয়া দিলেন। রাণী বলিলেন, —”কতদিন বোনদিগে দেখি না, ‘মায়ের পেটের রক্তের পোম্, আপন বলতে তিনটি বোন ’—সেই বোনদিগে আনাইয়া দিলে যে, তারাই আঁতুড়ঘরে যাইত! ”

রাজা আর কি করিয়া ‘না’ করেন? বলিলেন, —“আচ্ছা।” রাজপুরী হইতে ঘেসেড়ার বাড়ি কানাতের পথ পড়িল, রাজপুরী

হইতে রাঁধনের বাড়ি বাদ্য- ভাণ্ড বসিল; হাসিয়া নাচিয়া দুই বোনে রাণীবোনের আঁতুড়ঘর আগলাইতে আসিল।

"ও মা!"— আসিয়া দুজনে দেখে, রাণী- বোনের যে ঐশ্বর্য ! —

হীরামোতি হেলে না, মাটিতে পা ফেলে না,
সকল পুরী গমগমা; সকল রাজ্য রমরমা।

সেই রাজপুরীতে রাণী- বোন ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী !! —দেখিয়া, দুই বোনে হিংসায় জ্বলিয়া জ্বলিয়া মরে।

(৫)

রাণী কি আর অত জানেন? দিনদুপুরে, দুই বোন এঘর ওঘর সাতঘর আঁদি সাঁদি ঘোরে। রাণী জিজ্ঞাসা করেন, —"কেন লো দিদি, কি চা' স?" দিদিরা বলে —"না, না; এই, —আঁতুড়ে কত কি লাগে, তাই জিনিস- পাতি খুঁজি।" শেষে, বেলাবেলি দুই বোনে রাণীর আঁতুড়ঘরে গেল।

তিন প্রহর রাত্রে, আঁতুড়ঘরে, রাণীর ছেলে হইল। —ছেলে যেন চাঁদের পুতুল! দুই বোনে তাড়াতাড়ি হাতিয়া- পাতিয়া কাঁচা মাটির ভাঁড় আনিয়া ভাঁড়ে তুলিয়া, মুখে নুন, তূলা দিয়া, সোনার চাঁদ ছেলে নদীর জলে ভাসাইয়া দিল !

রাজা খবর করিলেন, "কি হইয়াছে?"

"ছাই! ছেলে না ছেলে, —কুকুরের ছানা! " দুইজনে আনিয়া এক কুকুরের ছানা দেখাইল। রাজা চুপ করিয়া রহিলেন। তার পর- বছর রাণীর আবার ছেলে হইবে। আবার দুই বোনে আঁতুড়ঘরে গেল।

কুকুরের ছানা

রাণীর এক ছেলে হইল। হিংসুকে ' দুই বোন আবার তেমনি করিয়া মাটির ভাঁড়ে করিয়া, নুন তূলা দিয়া, ছেলে ভাসাইয়া দিল।

রাজা খবর নিলেন, —"এবার কি ছেলে হইয়াছে? "

"ছাই ছেলে !না ছেলে—বিড়ালের ছানা!" দুই বোনে আনিয়া এক বিড়ালের ছানা দেখাইল!

বিড়ালের ছানা

রাজা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না!

তা'র পরের বছর রাণীর এক মেয়ে হইল। টুকটুকে মেয়ে, টুলটুলে মুখ, হাত পা যেন ফুল- তুকতুক্! হিংসুকে' দুই বোনে সে মেয়েকেও নদীর জলে ভাসাইয়া দিল।

রাজা আবার খবর করিলেন, —"এবার কি?"

"ছাই! কি না কি,—এক কাঠের পুতুল। " দুই বোনে রাজাকে আনিয়া এক কাঠের পুতুল দেখাইল! রাজা দুঃখে মাথা হেঁট করিয়া চলিয়া গেলেন।

রাজ্যের লোক বলিতে লাগিল, —“ ও মা! এ আবার কি ! অদিনে কুক্ষণে রাজা না - জানা না - শোনা কি আনিয়া বিয়ে করিলেন,— এক নয়, দুই নয়, তিন তিন বার ছেলে হইল —কুকুর ছানা, বিড়াল ছানা আর কাঠের পুতুল! এ অলক্ষণে’ রাণী কখখনো মনিষ্যি নয় গো, মনিষ্যি নয় —নিশ্চয় পেত্নী কি ডাকিনী। ”

রাজাও ভাবিলেন, —“ তাই তো! রাজপুরীতে কি অলক্ষ্মী আনিলাম—যা ’ক, এ রাণী আর ঘরে নিব না। ”

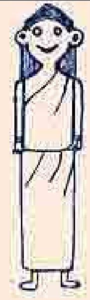
কাঠের পুতুল

হিংসুকে দুই বোনে মনের সুখে হাসিয়া গলিয়া, পানের পিক ফেলিয়া, আপনার আপনার বাড়ি গেল। রাজ্যের লোকেরা ডাকিনী রাণীকে উল্টাগাধায় উঠাইয়া, মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া, রাজ্যের বাহির করিয়া দিয়া আসিল।

(৬)

এক ব্রাহ্মণ নদীর ঘাটে স্নান করিতে গিয়াছেন, —স্নান- টান সারিয়া, ব্রাহ্মণ, জলে দাঁড়াইয়া জপ - আহ্নিক করেন, —দেখিলেন এক মাটির ভাঁড় ভাসিয়া আসে। না, —ভাঁড়ের মধ্যে সদ্য ছেলের কান্না শোনা যায়। আঁকুপাঁকু করিয়া ব্রাহ্মণ ভাঁড় ধরিয়া দেখেন, —এক দেবশিশু!

ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি করিয়া মুখের নুন তূলা ধোয়াইয়া শিশুপুত্র নিয়া ঘরে গেলেন। তা’র পরের বছর আর এক মাটির ভাঁড় ভাসিয়া

ভাসিয়া সেই ব্রাহ্মণের ঘাটে আসিল। ব্রাহ্মণ দেখিলেন, —আর এক দেবপুত্র! ব্রাহ্মণ সে - ও দেবপুত্র নিয়া ঘরে তুলিলেন।

তিন বছরের বছর আবার এক মাটির ভাঁড় ব্রাহ্মণের ঘাটে গেল। ব্রাহ্মণ ভাঁড় ধরিয়া দেখেন, —এবার—দেবকন্যা! ব্রাহ্মণের বেটা নাই, পুত্র নাই, তা'র মধ্যে দুই দেবপুত্র, আবার দেবকন্যা! — ব্রাহ্মণ আনন্দে কন্যা নিয়া ঘরে গেলেন।

হিংসুক মাসীরা ভাসাইয়া দিয়াছিল, ভাসানে ' রাজপুত্র রাজকন্যা গিয়া ব্রাহ্মণের ঘর আলো করিল। রাজার রাজপুরীতে আর বাতিটুকুও জ্বলে না।

(৭)

ছেলেমেয়ে নিয়া ব্রাহ্মণ পরম সুখে থাকেন। ব্রাহ্মণের চাটিমাটির দুঃখ নাই, গোলা - গঞ্জের অভাব নেই। ক্ষেতের ধান, গাছে ফল, কলস কলস গঙ্গাজল, ডোল - ভরা মুগ, কাজললতা গাইয়ের দুধ, —ব্রাহ্মণের টাকা পেটরায় ধরে না।

তা' হইলে কি হয়? 'কাহন কড়ি কে বা পুছে, কে বা বুড়ীর চক্ষু মুছে, '— ব্রাহ্মণের না ছিল ছেলে, না ছিল পুত্র। এত দিনে বুঝি পরমেশ্বর ফিরিয়া চাহিলেন, —ব্রাহ্মণের ঘরে সোনার চাঁদের ভরাবাজার! খাওয়া নাই, নাওয়া নাই, ব্রাহ্মণ দিন রাত ছেলেমেয়ে নিয়া থাকেন। ছেলে দুইটির নাম রাখিলেন, —অরুণ, বরুণ আর মেয়ের নাম রাখিলেন—

কিরণমালা

দিন যায়, রাত যায় —অরুণ বরুণ কিরণমালা চাঁদের মতন বাড়ে, ফুলের মতন ফোটে। অরুণ বরুণ কিরণের হাসি শুনিলে বনের পাখি আসিয়া গান ধরে, কান্না শুনিলে বনের হরিণ ছুটিয়া আসে। হেলিয়া দুলিয়া খেলে—তিন ভাই- বোনের নাচে ব্রাহ্মণের আঙ্গিনায় চাঁদের হাট ভাঙ্গিয়া পড়িল!

দেখিতে দেখিতে তিন ভাই- বোন বড় হইল। কিরণমালা বাড়িতে কূটাটুকু পড়িতে দেয় না, কাজললতা গাইয়ের গায়ে মাছিটি বসিতে দেয় না। অরুণ বরুণ দুই ভাইয়ে পড়ে; শোনে; ফল পাকিলে ফল পাড়ে; বনের হরিণ দৌড়ে ’ ধরে। তা ’র পর তিন ভাই- বোনে মিলিয়া ডালায় ফুল তুলিয়া ঘরবাড়ি সাজাইয়া আচ্ছন্ন করিয়া দেয়।

ব্রাহ্মণের আর কি? কিরণমালা মায়ে ডালিভরা ফুল আনে, দীপ চন্দন দেয়। ধূপ জ্বালাইয়া ঘণ্টা নাড়িয়া ব্রাহ্মণ "বম্- বম্" করিয়া পূজা করেন!

এমনি করিয়া দিন যায়। অরুণ বরুণ, ব্রাহ্মণের সকল বিদ্যা পড়িলেন; কিরণমালা ব্রাহ্মণের ঘরসংসার হাতে নিলেন।

তখন একদিন তিন ছেলে- মেয়ে ডাকিয়া, তিনজনের মাথায় হাত রাখিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন —" অরুণ, বরুণ, মা কিরণ, সব তোদের রহিল, আমার আর কেনো দুঃখ নাই, —তোমাদিগে রাখিয়া এখন আমি আর এক রাজ্যে যাই; সব দেখিয়া শুনিয়া

খাইও। ” তিন ভাই-বোনে কাঁদিতে লাগিলেন, ব্রাহ্মণ স্বর্গে চলিয়া গেলেন।

(৮)

মনের দুঃখে মনের দুঃখে দিন যায়, —রাজার রাজপুরী অন্ধকার। রাজা বলিলেন, —“না! আমার রাজত্ব পাপে ঘিরিয়াছে। চল, আবার মৃগয়ায় যাইব।” আবার রাজপুরীতে মৃগয়ার ডঙ্কা বাজিল।

রাজা মৃগয়ায় গিয়াছেন আর সেই দিন আকাশের দেবতা ভাঙ্গিয়া পড়িল। ঝড়ে, তুফানে, বৃষ্টি বাদলে —সঙ্গী সাথী ছাড়াইয়া, পথ পাথার হারাইয়া ঘুরঘুটি অন্ধকার, ঝমঝম্ বৃষ্টি —বৃক্ষের কোটরে রাজা রাত্রি কাটাইলেন।

পরদিন রাজা হাঁটেন, হাঁটেন, পথের শেষ নাই। রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ, দিক্ দিশা খাঁ খাঁ; জন মনুষ্য কোথায়, জল জলাশয় কোথায়, —হাঁপিয়া জাপিয়া ক্ষুধায় তৃষ্ণায় আকুল রাজা দেখেন, দূরে এক বাড়ি। রাজা সেই বাড়ির দিকে চলিলেন।

অরুণ বরুণ কিরণমালা তিন ভাই- বোন দেখে, —কি?—এক যে মানুষ, তাঁ’র হাতে পায়ে গায়ে মাথায় চিকচিক্! দেখিয়া অরুণ বরুণ অবাক হইল; কিরণ গিয়া দাদার কাছে দাঁড়াইল।

রাজা ডাকিয়া বলিলেন, —“ কে আছ, একটুকু জল দিয়া বাঁচাও।”

ছুটিয়া গিয়া, ভাই - বোনে জল আনিল। জল খাইয়া, অবাক রাজা, জিজ্ঞাসা করিলেন, —"দেবপুত্র দেবকন্যা—বিজন দেশে তোমারা কে?"

অরুণ বলিল, —" আমরা ব্রাহ্মণের ছেলেমেয়ে! "

রাজার বুক ধুকু ধুকু, রাজার মন উসু খুসু —' ব্রাহ্মণের ঘরে এমন ছেলেমেয়ে হয়! '— কিন্তু রাজা কিছু বলিতে পারিলেন না, চাহিয়া চাহিয়া, দেখিয়া দেখিয়া, শেষে চক্ষের জল পড়ে - পড়ে। রাজা বলিলেন, —"আমি জল খাইলাম না, দুধ খাইলাম! দেখ বাছারা, আমি এই দেশের দুঃখী রাজা। কখনও তোমাদের কোন কিছুর জন্য যদি কাজ পড়ে, আমাকে জানাইও, আমি তা ' করিব। " বলিয়া, রাজা নিঃশ্বাস ছাড়িয়া উঠিলেন।

তিন ভাই বোন দেখে,—গায়ে মাথায় চিকমিক্

তখন কিরণ বলিল, —" দাদা! রাজার কি থাকে? "

অরুণ বরুণ বলিল , —"তা' তো জানি না বোন —শুধু পুঁথিতে আছে, যে, রাজার হাতী থাকে, ঘোড়া থাকে, —অট্টালিকা থাকে। "

কিরণ বলিল, —"হাতী ঘোড়া কোথায় পাই; অট্টালিকা বানাও। "

অরুণ বরুণ বলিল, "আচ্ছা।"

(৯)

" আচ্ছা "— দিন কোথায় দিয়া যায়, রাত্রি কোথায় দিয়া যায়, কোন্ রাজ্য থেকে কি আনে, মাথার ঘাম মাটিতে পড়ে, ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, বারো মাস ছত্রিশ দিন চাঁদ সূর্য ঘুরে ' আসে, অরুণ বরুণ যে, অট্টালিকা বানায়। অরুণ বরুণ কাজ করে, কিরণমালা বোন ভরা ঘাটের ধরা জল হাঁড়িতে হাঁড়িতে ভরিয়া আনিয়া দেয়। বারো মাসে ছত্রিশ দিনে, সেই অট্টালিকা তৈয়ার হইল।

সে অট্টালিকা দেখিয়া ময়দানব উপোস করে, বিশ্বকর্মা ঘর ছাড়ে— অরুণ বরুণ কিরণের অট্টালিকা সূর্যের আসন ছোঁয়, চাঁদের আসন কাড়ে! শ্বেতপাথর ধব্ ধব্, শ্বেতমাণিক রব্ রব্; দুয়ারে দুয়ারে রূপার কবাট, চূড়ায় চূড়ায় সোনার কলসী ! অট্টালিকার চারিদিকে ফুলের গাছ, ফলের গাছ—পক্ষী- পাখালিতে আঁটে না। মধুর গন্ধে অট্টালিকা ভুর্ ভুর্, পাখির ডাকে অট্টালিকা মধুরপুর ! অরুণ বরুণ কিরণের বাড়ি দেবে দৈত্য চাহিয়া দেখে !

একদিন এক সন্ন্যাসী নদীর ওপার দিয়া যান! যাইতে- যাইতে সন্ন্যাসী বলেন, —

"বিজন দেশের বিজন বনে কে- গো বোন ভাই?—
কে ' গড়েছ, এমন পুরী, তুলনা তার নাই! "—

পুরী হইতে অরুণ বলিলেন, —

"নিত্য নূতন চাঁদের আলো আপনি এসে পড়ে,
অরুণ বরুণ কিরণমালা ভাই- বোনটির ঘরে !"

সন্ন্যাসী বলিলেন, —
"অরুণ বরুণ কিরণমালার রাঙা রাজপুরী
দেখতে সুখ শুনতে সুখ, ফুটত আরো ছীরি।
এমন পুরী আরো কত হ'ত মনোলোভা,
কি যে চাই, কি যেন নাই, তা'ইতে না হয় শোভা।
এমন পুরী, —রূপার গাছে ফলবে সোনার ফল।
ঝর্- ঝরিয়ে পড়বে ঝরে মুক্তা - ঝরার জল।
হীরা গাছে সোনার পাখির শুনব মধুস্বর —
মাণিক- দানা ছড়িয়ে রবে পথের কাঁকর।
তবে এমন পুরী হবে তিন ভুবনের সার, —
সোনার পাখির এক- এক ডাকে সুখের পাথার।"

শুনিয়া, অরুণ- বরুণ - কিরণ ডাকিয়া বলিলেন, —

"কোথায় এমন রূপার গাছ,
কোথায় এমন পাখি,
কোথায় সে মুক্তা- ঝরা,
বল্লে এনে রাখি।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, —

“উত্তর পূব, পূবের উত্তর মায়াপাহাড় আছে”

“উত্তর পূব, পূবের উত্তর
মায়া- পাহাড় আছে,
নিত্য ফলে সোনার ফল
সত্যি হীরার গাছে।
ঝর্ - ঝরিয়ে, মুক্তা - ঝরা
শীতল ব’য়ে যায়,
সোনার পাখি, ব’সে আছে
বৃক্ষের শাখায়!
মায়ার পাহাড় মায়ায় ঢাকা
মায়ায় মারে তীর—
এ সব যে আনতে পারে
সে বড় বীর! ”

বলিতে বলিতে সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন।

অরুণ বরুণ বলিলেন, —“বোন, আমরা এ সব আনিব।”

(১০)

অরুণ বলিলেন, —“ভাই বরুণ, বোন কিরণ, তোরা থাক, আমি মায়া পাহাড়ে গিয়া সব নিয়া আসি। ” বলিয়া অরুণ, বরুণ কিরণের কাছে এক তরোয়াল দিলেন, —“যদি দেখ, যে, তরোয়ালে মরিচা ধরিয়াছে, তো জানিও আমি আর বাঁচিয়া নাই। ” তরোয়াল রাখিয়া অরুণ চলিয়া গেলেন।

দিন যায়, মাস যায়, বরুণ কিরণ রোজ তরোয়াল খুলিয়া খুলিয়া দেখেন। একদিন, তরোয়াল খুলিয়া বরুণের মুখ শুকাইল; ডাক দিয়া বলিলেন, —“বোন, দাদা আর এ সংসারে নাই! এই তীর ধনুক রাখ, আমি চলিলাম। যদি তীরের আগা খসে, ধনুর ছিলা ছিঁড়ে, তো জানিও আমিও নাই।”

কিরণমালা অরুণের তরোয়ালে মরিচা দেখিয়া কাঁদিয়া অস্থির। বরুণের তীর ধনুক তুলিয়া নিয়া বলিল, —“হে ঈশ্বর। বরুণদাদা যেন অরুণদাদাকে নিয়া আসে! ”

(১১)

—মায়া পাহাড়—

⁎⁎পায়ের নীচে কত পাহাড় টলে' গেল,
কত পাথর গলে গেল।⁎⁎

যাইতে যাইতে বরুণ মায়া পাহাড়ের দেশে গেলেন। অমনি চারিদিকে বাজনা বাজে, অপ্সরী নাচে, —পিছন হইতে ডাকের উপর ডাক—

"রাজপুত্র! রাজপুত্র! ফিরে ' চাও! ফিরে' চাও! কথা শোন !"

বরুণ ফিরিয়া চাহিতেই পাথর হইয়া গেলেন —"হায়! দাদাও আমার পাথর হইয়াছেন।"

আর হইয়াছেন; —কে আসিয়া উদ্ধার করিবে? অরুণ বরুণ জন্মের মত পাথর হইয়া রহিলেন।

ভোরে উঠিয়া কিরণমালা দেখেন তীরের ফলা খসিয়া গিয়াছে, ধনুর ছিলা ছিঁড়িয়া গিয়াছে—অরুণদাদা গিয়াছে, বরুণদাদাও গেল। কিরণমালা কাঁদিল না, কাটিল না, চক্ষের জল মুছিল না; উঠিয়া কাজললতাকে খড় খৈল দিল, গাছ- গাছালির গোড়ায় জল দিল, দিয়া, রাজপুত্রের পোষাক পরিয়া, মাথে মুকুট হাতে তরোয়াল, —কাজললতার বাছুরকে, হরিণের ছানাকে চুমু খাইয়া,

চক্ষের পলক ফেলিয়া কিরণমালা মায়া পাহাড়ের উদ্দেশে বাহির হইল।

যায়, —যায়, —কিরণমালা আগুনের মত উঠে, বাতাসের আগে ছুটে; কে দেখে, কে না- দেখে ! দিন রাত্রি, পাহাড় জঙ্গল, রোদ বান সকল লুটালুটি গেল; ঝড় থমকাইয়া বিদ্যুৎ চমকাইয়া তের রাত্রি তেত্রিশ দিনে কিরণমালা পাহাড়ে গিয়া উঠিলেন।

অমনি চারিদিক দিয়া দৈত্য, দানা, বাঘ, ভালুক, সাপ, হাতী, সিংহ, মোষ, ভূত পেত্নীতে আসিয়া কিরণমালাকে ঘিরিয়া ধরিল।

এ ডাকে, —“রাজপুত্র, তোকে গিলি! ”
ও ডাকে, —“রাজপুত্র, তোকে খাই! ”
“হাম্... . . . . হুম্ ! . . . . হাঁই !
“ হম্.. . . . . হম্ ! . . . . হঃ ! ”
“ হুম্!. . . . . হাম্ ..! . . . . !. ”
“ ঘাঁ! . . . . ”

পিঠের উপর বাজনা বাজে, —

“তা কাটা ধা কাটা
ভ্যাং ভ্যাং চ্যাং—
রাজপুত্রের কেটে নে
ঠ্যাং! ”

করতাল ঝন্ ঝন্—
খরতাল খন্ খন্—
ঢাক ঢোল —মৃদঙ্গ কাড়া—
ঝক্ ঝক তরোয়াল, তর্ তর্ খাঁড়া —

অপ্সরা নাচে, —“রাজপুত্র, রাজপুত্র এখনো শোন্! ”
মায়ার তীর, —ধনুকে ধনুকে টানে গুণ; —

উপরে বৃষ্টি বজ্রের ধারা, মেঘের গর্জন লক্ষ কাড়া, —শব্দে, রবে আকাশ ফাটিয়া পড়ে, পাহাড় পর্বত উল্টে, পৃথিবী চৌচীর যায়! —সাত পৃথিবী থর থর কম্পমান, —বাজ, বজ্র, — শিল, —চমক—!

* * * *

নাঃ! কিছুতেই কিছু না ! —সব বৃথায়, সব মিছায়! — কিরণমালা তো রাজপুত্র নন, কিরণমালা কোনদিকে ফিরিয়া চাহিল না, পায়ের নীচে কত পাথর টলে’ গেল, কত পাথর গলে ’ গেল, —চক্ষের পাতা নামাইয়া তরোয়াল শক্ত করিয়া ধরিয়া, সোঁ সোঁ করিয়া কিরণমালা সরসর একেবারে সোনার ফল হীরার গাছের গোড়ায় গিয়া পৌঁছিল।

আর অমনি হীরার গাছে সোনার পাখী বলিয়া উঠিল, — “আসিয়াছ? আসিয়াছ? ভালই হইয়াছে। এই ঝরণার জল নাও, এই ফুল নাও, আমাকে নাও, ওই যে তীর আছে নাও, ওই যে ধনুক আছে নাও, নাও নাও, দেরি করিও না; সব নিয়া, ওই যে ডঙ্কা আছে, ডঙ্কায় ঘা দাও। ”

পাখীর এক- এক কথা বলে, কিরণমালা এক - এক জিনিস নেয়। নিয়া গিয়া, কিরণমালা ডঙ্কায় ঘা দিল।”

সব চুপ্চাপ্! মায়া পাহাড় নিঝুম। খালি কোকিলের ডাক, দোয়েলের শীস্, ময়ূরের নাচ !

তখন পাখী বলিল, —

“কিরণমালা, শীতল ঝরণার জল ছিটাও।”

কিরণমালা সোনার ঝারি ঢালিয়া জল ছিটাইলেন, চারিদিকে পাহাড় মড়্মড়্ করিয়া উঠিল, সকল পাথর টক্- টক্ করিয়া উঠিল, — যেখানে জলের ছিটা- ফোঁটা পড়ে, যত যুগের যত রাজপুত্র আসিয়া পাথর হইয়াছিলেন, চক্ষের পলকে গা - মোড়া দিয়া উঠিয়া বসেন।

সাত যুগের ধন্য বীর

দেখিতে- দেখিতে সকল পাথর লক্ষ লক্ষ রাজপুত্র হইয়া গেল। রাজপুত্রেরা জোড় হাত করিয়া কিরণমালাকে প্রণাম করিল, —

“সাত যুগের ধন্য বীর!”

অরুণ বরুণ চোখের জলে গলিয়া বলিলেন, —“মায়ের পেটের ধন্য বোন।”

মাথার উপর সোনার পাখী বলিল, —

"অরুণ বরুণ কিরণমালা
তিনটি ভুবন করলি আলা!"

(১২)

পুরীতে আসিয়া অরুণ বরুণ কিরণমালা কাজললতাকে ঘাস- জল দিলেন, কাজললতার বাছুর খুলিয়া দিলেন, হরিণছানা নাওয়াইয়া দিলেন, আঙ্গিনা পরিষ্কার করিলেন, গাছের গোড়ায় গোড়ায় জল দিলেন, জঞ্জাল নিলেন, —দিয়া নিয়া, বাগানে রূপার গাছের বীজ হীরার গাছের ডাল পুঁতিলেন, মুক্তাঝরণা- জলের ঝারির মুখ খুলিলেন, মুক্তার ফল ছড়াইয়া দিলেন; সোনার পাখীকে বলিলেন, —" পাখী! এখন গাছে ব'স।"

তর্ তর্ করিয়া হীরার গাছ বড় হইল, ফর্ ফর্ করিয়া রূপার গাছ পাতা মেলিল, রূপার ডালে হীরার শাঁখে টুকটুকেটুক সোনার ফল থোবায় থোবায় দুলিতে লাগিল; হীরার ডালে সোনার পাখী বসিয়া হাজার সুরে গান ধরিল। চারিদিকে মুক্তার ফল থরে থরে চম্-চম্—তা 'রি মধ্যে শীতল ঝরণায় মুক্তার জল ঝর্ ঝর করিয়া ঝরিতে লাগিল।

পাখী বলিল, —" আহা! "

অরুণ বরুণ কিরণ তিন ভাই- বোন গলাগলি করিলেন।

(১৩)

বনের পাখী পারে না, বনের হরিণ পারে না, তা মানুষে কি থাকিতে পারে? ছুটিয়া আসিয়া দেখে —" আঃ! পুরী যে—পুরী। ইন্দ্রপুরী পৃথিবীতে নামিয়া আসিয়াছে। "

খবর রাজার কাছে গেল। শুনিয়া রাজা বলিলেন, —" তাই না কি! সে ব্রাহ্মণের ছেলেরা এমন সব করিল! "

সে রাতে সোনার পাখী বলিল, —" অরুণ বরুণ কিরণমালা! রাজাকে নিমন্ত্রণ কর। "

তিন ভাই- বোন্ বলিলেন, —" সে কি! রাজাকে নিমন্ত্রণ করিয়া কি খাওয়াইব?"

পাখী বলিল, —" সে আমি বলিব! "

অরুণ বরুণ ভোরে গিয়া রাজাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন।

সোনার পাখী বলিল, —" কিরণ! রাজা মহাশয় যেখানে খাইতে বসিবেন, সেই ঘরে আমাকে টাঙ্গাইয়া দিও। "

কিরণ বলিল, —"আচ্ছা। "

(১৪)

ঠাট কটক নিয়া, জাঁকজমক করিয়া, রাজা নিমন্ত্রণ খাইতে আসিয়া, দেখেন, — কি!! —রাজা আসিয়া, দেখেন —আর চম্কেন; দেখেন, দেখেন— আর 'থ' খান। পুরীর কানাচে কোণে যা ', রাজভাণ্ডার ভরিয়াও তা নাই। "এসব এরা কোথায় পাইল? —এরা কি মানুষ! —হায়!! " একবার রাজা আনন্দে হাসেন, আবার রাজা দুঃখে ভাসেন— আহা, ইহারাই যদি তাঁহার ছেলেমেয়ে হইত!

রাজা বাগান দেখিলেন, ঝরণা দেখিলেন; দেখিয়া শুনিয়া, সুখে, দুঃখে, রাজার চোখ ফাটিয়া জল আসে, চোখে হাত দিয়া রাজা বলিলেন, —" আর তো পারি না। ঘরে চল। "

ঘরে এদিকে মণি, ওদিকে মুক্তা, এখানে পান্না, ওখানে হীরা। রাজা অবাক।

তা'রপর রাজা খাবার ঘরে। —রকমে রকমে খাবার জিনিস থালে থালে, রেকাবে রেকাবে, বাটিতে বাটিতে, ভাড়ে- ভাড়ে রাজার কাছে আসিল ! সুবাসে সুগন্ধে ঘর ভরিয়া গেল।

আশ্চর্যে, বিস্ময়ে, রাজা, আস্তে আস্তে আসিয়া আসন নিলেন। আস্তে আস্তে অবাক রাজা, থালে হাত দিয়াই —

—রাজা হাত তুলিয়া বসিলেন! —

"এ কি! —সব যে মোহরের!"

"তাহাতে কি?"

রাজা। "এ কি খাওয়া যায়?"

"কেন যাইবে না? পায়েস, পিঠা, ক্ষীর, সর, মিঠাই, মোণ্ডা, রস, লাড্ডু— খাওয়া যাইবে না?"

রাজা বলিলেন, —"কে এ কথা বলে? অরুণ বরুণ কিরণ! তোমরাও কি আমার সঙ্গে তামাসা করিতেছ? মোহরের পায়েস, মোতির পিঠা, মুক্তার মিঠাই, মণির মোণ্ডা, এসব মানুষে কেমন করিয়া খাইবে? এ কি খাওয়া যায়?"

"কে এ কথা বলে"

মাথার উপর হইতে কে বলিল, — "মানুষের কি কুকুর- ছানা হয়?"

"—অ্যাঁ —"

"রাজা মহাশয়, —মানুষের কি বিড়াল ছানা হয়?"

"—অ্যাঁ!" রাজা চমকিয়া উঠিলেন! দেখিলেন, সোনার পাখীতে বলিতেছে, —

" মহারাজ, এ সব যদি মানুষে খাইতে না পারে, তো, মানুষের পেটে কাঠের পুতুল কেমন করিয়া হয়? "

রাজা বলিলেন, —" তা 'ই তো, তা 'ই তো—আমি কি করিয়াছি!! " রাজা আসন ছাড়িয়া উঠিলেন।

সোনার পাখী বলিল, —
"মহারাজ, এখন বুঝিলেন? ইহারাই আপনার ছেলেমেয়ে। দুষ্টু মাসীরা মিথ্যা করিয়া কুকুর- ছানা, বিড়াল - ছানা, কাঠের পুতুল দেখাইয়াছিল।"

রাজা থরথর কাঁপিয়া, চোখের জলে ভাসিয়া, অরুণ- বরুণ - কিরণকে বুকে নিলেন। "হায়! দুঃখিনী রাণী যদি আজ থাকিত ! "

সোনার পাখী চুপি চুপি বলিল, —" অরুণ বরুণ কিরণ! নদীর ও - পারে যে কুঁড়ে, সেই কুঁড়েতে তোমাদের মা থাকেন, বড় দুঃখে মর - মর হইয়া তোমাদের মায়ের দিন যায়; গিয়া তাঁহাকে নিয়া আইস। "

তিন ভাই- বোন অবাক হইয়া চোখের জলে গলিয়া মাকে নিয়া আসিল। দুঃখিনী মা ভাবিল, —" আহা স্বর্গে আসিয়া বাছাদের পাইলাম! "

সোনার পাখী গান করিল, —

"অরুণ বরুণ কিরণ,
তিন ভুবনের তিন ধন।
এমন রতন হারিয়ে, ছিল
মিছাই জীবন।
অরুণ বরুণ কিরণমালা
আজ ঘুচা' লি সকল জ্বালা।"

তাহার পর আর কি? আনন্দের হাট বসিল। রাজা রাজত্ব তুলিয়া আনিয়া, অরুণ বরুণ কিরণের পুরীতে রাজপাট বসাইয়া দিলেন। সকল প্রজা সাত দিন সাত রাত্রি ধরিয়া মণি- মুক্তা হীরা - পান্না নিয়া হুড়াহুড়ি খেলিল।

তাহার পর আর এক দিন, রাজ্যের কতকগুলা জল্লাদ হৈ হৈ করিয়া গিয়া ঘেসেড়ার বাড়ি, সূপকারের বাড়ি জ্বালাইয়া দিয়া, রাণীর পোড়ারমুখী দুই বোনকে হেঁটে কাঁটা উপরে কাঁটা দিয়া পুঁতিয়া ফেলিয়া চলিয়া আসিল।

তাহার পর রাজা, রাণী, অরুণ বরুণ কিরণমালা, নাতি-নাতকুড় লইয়া কোটি - কোটীশ্বর হইয়া যুগ যুগ রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

‘রূপ-তরাসী’

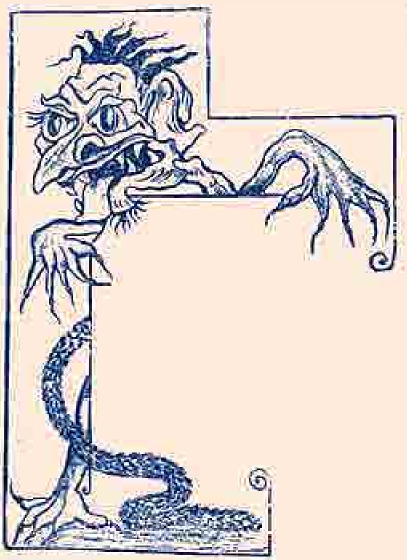

‘রূপ-তরাসী’

‘হাঁ—উ মাঁ —উ কাঁ —উ’ শুনি রাক্ষসেরি পুর
না জানি সে কোন্ দেশে —না জানি কোন্ দূর!

*　　　　　*　　　　　*

রূপ দেখতে তরাস লাগে,　বলতে করে ভয়,
কেমন করে’ রাক্ষসীরা মানুষ হয়ে রয়!
চ— প্ চ —প্ চিবিয়ে খেলে আপন পেটের ছেলে,
সোনার ডিম লোহার ডিম কৃষাণ কোথায় পেলে —
কেমন করে’ ধ্বংস হল খোক্কসের পাল —
কেমন করে উঠল কেঁপে নেঙ্গা তরোয়াল!

পায়ের নীচে কড়ির পাহাড় হাড়ের পাহাড় চুর —
রাজপুত্র কে গিয়াছে পাশাবতীর পুর?
হিল্ হিল্ হিল্ কাল্- নিশিতে—গর্জে কোথায় সাপ —
রাজার পুরীর ধ্বংস কোথায় হাজার সিঁড়ির ধাপ!
আকাশ পাতাল সাপের হাঁ কোথায় পাহাড় বন,
থর্ থর্ থর্ গাছের ডালে বন্ধু দুজন !
চরকা কোথায় ঘ্যাঁঘর্ ঘ্যাঁঘর্ —পেঁচোর কিবা রূপ, —
মণির আলোয় কোন্ কন্যার অগাধ জলে ডুব ’!
কবে কথায় চার বন্ধুতে হল ঘরের বার, —
“হী হী হী! ” হরিণ- মাথা রাক্ষস আকার।
আমের ভিতর রাজার ছেলে লুকিয়ে ছিল কে,
রাজকন্যা, নিয়ে এল সাগর পারে গে ’!
কবে কোথায় রাক্ষসীর হাড় মুড়্ মুড়্ করে
রাজার ছেলের রসাল কচি মুণ্ডু খাবার তরে-!
রাক্ষসের বংশ উজাড় রাজপুত্রের হাতে —
লেখা ছিল সে সব কথা ‘রূপতরাসী’র পাতে!

নীলকমল আর লালকমল

(১)

এক রাজার দুই রাণী; তাহার এক রাণী যে রাক্ষসী! কিন্তু , এ কথা কেহই জানে না।

দুই রাণীর দুই ছেলে; —লক্ষ্মী মানুষ- রাণীর ছেলে কুসুম, আর রাক্ষসী - রাণীর ছেলে অজিত। অজিত কুসুম দুই ভাই গলাগলি।

জিভ্ লক্ লক্

রাক্ষসী- রাণীর মনে কাল, রাক্ষসী - রাণীর জিভে লাল। রাক্ষসী কি তাহা দেখিতে পারে?—কবে সতীনের ছেলের কচি কচি হাড়- মাংসে ঝোল অম্বল রাঁধিয়া খাইবে; — তা পেটের দুষ্ট ছেলে সতীন- পুতের সাথ ছাড়ে না। রাগে রাক্ষসীর দাঁতে - দাঁতে কড়্ কড়্ পাঁচ পরাণ সর্ সর্।—

যো না পাইয়া রাক্ষসী ছুতা- নাতা খোঁজে, চোখের দৃষ্টি দিয়া সতীনের রক্ত শোষে।

দিন দণ্ড যাইতে না যাইতে লক্ষ্মীরাণী শয্যা নিলেন।

তখন ঘোমটার আড়ে জিভ্ লকলক্, আনাচে কানাচে উঁকি।

দুই দিনের দিন লক্ষ্মীরাণীর কাল হইল। রাজ্য শোকে ভাসিল। কেহ কিচ্ছু বুঝিল না।

অজিতকে "সর্ সর্ " কুসুমকে "মর্ মর্ ', — রাক্ষসী সতীন পুতকে তিন ছত্রিশ গালি দেয়, আপন পুতকে ঠোনা মারিয়া খেদায়।

দাদাকে নিয়া গিয়া অজিত নিরালায় চোখের জল মুছায় —" দাদা, আর থাক্ আর আমরা মার কাছে যাব না। রাক্ষসী- মা'র কাছে আর কেহই যায় না! লোহার প্রাণ অজিত সব সয়; সোনার প্রাণ কুসুম ভাঙ্গিয়া পড়ে। দিনে দিনে কুসুম শুকাইতে লাগিল।

(২)

রাণী দেখিল,

কি! আপন পেটের পুত্র,
সে - ই হইল শত্রু! –

রাণীর মনের আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

এক রাত্রে রাজার হাতীশালে হাতী মরিল, ঘোড়াশালে ঘোড়া মরিল, গোহালে গরু মরিল; – রাজা ফাঁপরে পড়িলেন।

রাক্ষসের হাতে কুসুম কাটির পুতুল

পর রাত্রে ঘরে" কাঁই মাঁই! ! " চমকিয়া রাজা তলোয়ার নিয়া উঠিলেন।– সোনার খাটে অজিত- কুসুম ঘুমায়; এক মস্ত রাক্ষস কুসুমকে ধরিয়া আনিল। রাক্ষসের হাতে কুসুম কাটির পুতুল! ছুটিয়া আসিয়া মাথার চুল ছিঁড়িয়া রাজার গায়ে মারিল, – হাত নড়ে না, পা নড়ে না, রাজা বোকা হইয়া গেলেন।

রাজার চোখের সামনে রাক্ষস কুসুমকে খাইতে লাগিল। রাজা চোখের জলে ভাসিয়া গেলেন, মুছিতে পারিলেন না। রাজার শরীর থরথর কাঁপে, রাজা বসিতে পারিলেন না। রাণী খিলখিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

রাজার চোখের সামনে রাক্ষস কুসুমকে খাইতে লাগিল। রাজা চোখের জলে ভাসিয়া গেলেন, মুছিতে পারিলেন না। রাজার শরীর থরথর কাঁপে, রাজা বসিতে পারিলেন না। রাণী খিলখিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

অজিতের ঘুম ভাঙ্গিল; –

রাত যেন নিশে
মন যেন বিষে,
দাদা কাছে নাই কেন?

অজিত ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দেখে, ঘর ছম্‌ছম্‌ করিতেছে, রাণীর হাতে বালা- কাঁকণ ঝম্‌ঝম্‌ করিতেছে, – দাদাকে রাক্ষসে খাইতেছে! গায়ের রোমে কাঁটা, চোখের পলক ভাঁটা, অজিত ছুটিয়া গিয়া রাক্ষসের মাথায় এক চড় মারিল। রাস "আঁই আঁই ' করিয়া ঘুরিয়া পড়িয়া এক সোনার ডেলা উগরিয়া পলাইয়া গেল!

রাণী দেখিল, পৃথিবী উল্টিয়াছে- পেটের ছেলে শত্রু হইয়াছে ! রাণী মনের আগুনে জ্ঞান - দিশা হারাইয়া আপনার ছেলেকে মুড়মুড় করিয়া চিবাইয়া খাইল ! রাণীর গলা দিয়া এক লোহার ডেলা গড়াইয়া পড়িল।

রাণীর পা উছল, রাণীর চোখ উখর, সোনার ডেলা লোহার ডেলা নিয়া রাণী ছাদে উঠিল।

ছাদে রাক্ষসের হাট। একদিকে বলে—

হুঁম্ হুঁম্ থাম্- আঁরো খাঁবো।

আর এক দিকে বলে, –

গুম্ গুম্ গাঁম্- দেঁশে যাঁবো।

রাণী বলিল—
" গব্ গব্ গুম্ থম্ থম্ খাঃ!
আমি হেঁথা থাকি, তোঁরা দেশে যায়ঃ !"

রাজপুরীর চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িল, রাজার বুক কাঁপিয়া উঠিল; – গাছ- পাথর মুচ্‌ড়িয়া, নদীর জল উছিলয়া রাক্ষসের ঝাঁক দেশে ছুটিল।

ঘরে গিয়া রাণীর গা জ্বলে, পা জ্বলে; রাণী সোয়াস্তি পায় না। বাহিরে গিয়া রাণীর মন ছন্ছন্, বুক কনকন; রাত আর পোহায় না।

না পারিয়া রাণী আরাম- কাটি জিরাম - কাটিটি বাহির করিয়া পোড়াইয়া ফেলিল। তাহার পর, মায়া - মেঘে উঠিয়া, নদীর ধারে এক বাঁশ - বনের তলে সোনার ডেলা, লোহার ডেলা পুঁতিয়া রাখিয়া, রাক্ষসী - রাণী, নিশ্চিত হইয়া ফিরিয়া আসিল।

বাঁশের আগে যে কাক ডাকিল, ঝোপের আড়ে যে শিয়াল কাঁদিল, রাণী তাহা শুনিতে পাইল না।

(৩)

পরদিন রাজ্যে হুলুস্থুল। ঘরে ঘরে মানুষের হাড়, পথে পথে হাড়ের জাঙ্গাল! রাক্ষসে দেশ ছাইয়া গিয়াছে, আর রক্ষা নাই। যখন সকলে শুনিল, রাজপুত্রদেরও খাইয়াছে, তখন জীবন্ত মানুষ দলে - দলে রাজ্য ছাড়িয়া পলাইয়া গেল।

দলে দলে লোক পলাইল

রাজা বোকা হইয়া রহিলেন; রাজার রাজত্ব রাক্ষসে ছাইয়া গেল।

(৪)

নদীর ধারে বাঁশের বন হাওয়ায় খেলে, বাতাসে দোলে। এক কৃষাণ সেই বনের বাঁশ কাটিল। বাঁশ চিবিয়া দেখে, দুই বাঁশের মধ্যে বড় বড় গোল দুই ডিম। সাপের ডিম, না কিসের ডিম। কৃষাণ ডিম ফেলিয়া দিল।

অমনি, ডিম ভাঙ্গিয়া, লাল নীল ডিম হইতে লাল নীল রাজপুত্র বাহির হইয়া, –মুকুট মাথে খোলা তরোয়াল হাতে জোড়া রাজপুত্র শন্ শন্ করিয়া রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া গেল!

ডরে কৃষাণ মূর্ছা গেল।

যখন উঠিল, কৃষাণ দেখে, লাল ডিমের খোলস সোনার আর নীল ডিমের খোলস লোহা হইয়া পড়িয়া আছে! তখন লোহা দিয়া কৃষাণ কাস্তে গড়াইল; সোনা দিয়া ছেলের বউর পঁইচে, বাজু বানাইয়া দিল।

চলিয়া চলিয়া, জোড়া রাজপুত্র এক রাজার রাজ্যে আসিলেন। সে রাজ্যে বড় খোক্কসের ভয়। রাজা রোজ মন্ত্রী রাখেন, খোক্কসেরা সে মন্ত্রী খাইয়া যায় আর এক ঘর প্রজা খায়। রাজা নিয়ম করিয়াছেন, যে কোন জোড়া রাজপুত্র খোক্কস মারিতে পারিবে, জোড়া পরীর মত জোড়া রাজকন্যা আর তাঁহার রাজত্ব তাহারাই পাইবে। কত জোড়া রাজপুত্র আসিয়া খোক্কসের পেটে গেল। কেহই খোক্কস মারিতে পারে না; রাজকন্যাও পায় নাই, রাজ্যও পায় নাই।

জোড়া রাজপুত্র শন্ শন্ করিয়া–চলিয়া গেল

লালকমল নীলকমল জোড়া রাজপুত্র রাজার কাছে গিয়া বলিলেন, – " আমরা খোক্কস মারিতে আসিয়াছি! "

রাজার মনে একবার আশা নিরাশা; শেষে বলিলেন, – "আচ্ছা।"

নীলকমল লালকমল এক কুঠুরিতে গিয়া, তরোয়াল খুলিয়া বসিয়া রহিলেন।

(৫)

রাত্রি ক’ দন্ড হইল, কেহ আসিল না।
রাত্রি আর ক’দন্ড গেল, কেহ আসিল না।
রাত্রি একপ্রহর হইল, তবু কেহ আসিল না।

শেষে, রাত্রি দুপুর হইল; কেহ আর আসে না। দুই ভাইয়ের বড় ঘম পাইল। নীল লালকে বলিলেন, – “দাদা! আমি ঘুমাই, পরে আমাকে জাগাইয়া তুমি ঘুমাইও। ” বলিয়া, বলিলেন, – “খোক্কসে যদি নাম জিজ্ঞাসা করে তো, আমার নাম আগে বলিও, তোমার নাম যেন আগে বলিও না।” লালকমল তরোয়ালে ভর দিয়া সজাগ হইয়া বসিলেন।

খোক্কসেরা আসিয়াই, – আলোতে ভাল দেখিতে পায় না কি-না?- বলিল, – “ আলোঁ নিঁবোঁ। ”

লালকমল বলিলেন, – “না! ”

সকলের বড় খোক্কস রাগে গঁর গঁর, – বলিল- “বঁটে! ঘরে কেঁ জাঁগেঁ?” যত খোক্কসে কিচিমিচি, – “কেঁ জাঁগেঁ, কেঁ জাঁগেঁ?”

লালকমল উত্তর করিলেন–
“নীলকমল জাগে, লালকমল জাগে
আর জাগে তরোয়াল,

দপদপ করে ঘিয়ের দীপ জাগে–কার এসেছে কাল?”

নীলকমলের নাম শুনিয়া খোক্কসেরা ভয়ে তিন হাত পিছাইয়া গেল! নীলকমল আর জন্মে রাক্ষসী - রাণীর পেটে হইয়াছিল, তাই তাঁর শরীরে কি - না রাক্ষসের রক্ত ! খোক্কসেরা তাহা জানিত। সকলে বলিল, –“আচ্ছা নীলকমল কি- না পরীক্ষা কর। ”

রাক্ষস- খোক্কসেরা নানা রকম ছলনা চাতুরী করে ’ সকলের বড় খোক্কসেটা সেই সব আরম্ভ করিল। বলিল, –তোঁদের নঁখের ডাঁগাঁ দেঁখিঁ?"

লাল, নীলের মুকুটটা তরোয়ালের খোঁচা দিয়া বাহির করিয়া দিলেন। সেটা হাতে করিয়া খোক্কসেরা বলাবলি করিতে লাগিল—

বাঁপ্ রেঁ ! ঐ যাঁর নঁখের ডগাঁ এঁমঁন, না জাঁনি সেঁ কিঁ রেঁ !

বাঁপ্ রেঁ–না জাঁনি সেঁ কিঁ রেঁ!

তখন আবার বলিল, – দেঁখি তোঁদেঁর থুঁ থুঁ কেঁমঁন।”

লালকমল তরোয়াল প্রদীপের ঘি গরম করিয়া ছিটাইয়া দিলেন। খোক্কসদের লোম পুড়িয়া গন্ধে ঘর ভরিল; খোক্কসেরা আবার আসিয়া বলিল, – " তোঁদেঁর জিঁভঁ দেঁখিবঁ।"

লাল, নীলের তরোয়ালখানা দুয়ারের ফাঁক দিয়া বাড়াইয়া দিলেন। বড় খোক্কস দুই হাতে তরোয়াল ধরিয়া, আর সকল খোক্কসকে বলিল, – " এঁইবাঁর জিঁভ্ টানিয়া ছিঁড়িবঁ, তোঁরাঁ আঁমাঁকে ধঁরিঁয়াঁ জোঁরেঁ টাঁন্- ন্ - ন্।"

খুঁব জোরে টান্-ন্-নঁ-

সকলে মিলিয়া খুব জোরে টানিল, আর তর্তর্ ধার নেঙ্গা তরোয়ালে বড় খোক্কসের দুই হাত কাটিয়া কালো রক্তের বান ছুটিল! চেচাঁইয়া মেচাইয়া সকল খোক্কস ডিঙ্গাইয়া বড় খোক্কস পলাইয়া গেল !

অনেকক্ষণ পরে বড় খোক্কস আবার কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া বলিল, –"কেঁ জাঁগেঁ, কে জাঁগেঁ? "

কতক্ষণ খোক্কস আসে নাই, লালকমলের ঘুম পাইতেছিল; লালকমল ভুলে বলিয়া ফেলিলেন, –
" লালকমল জাগে, আর- "

মুখের কথা মুখে, –দুয়ার কবাট ভাঙ্গিয়া সকল খোক্কস লালকমলের উপর আসিয়া পড়িল। ঘিয়ের দীপ উল্টিয়া গেল, লালের মাথার মুকুট পড়িয়া গেল;

লাল ডাকিলেন- "ভাই!"

নীলকমল জাগিয়া দেখেন, – খোক্কস! গা মোড়ামুড়ি দিয়া নীল বলিলেন, –

গিরগটীর ছা

"আরামকাকাটি জিরামকাটি, কে জাগিস্ রে?
দ্যাখ তো দুয়ারে মোর ঘুম ভাঙ্গে কে!"

নীলকমলের সাড়ায় আ- খোক্কস ছা - খোক্কস সকল খোক্কস আধমরা হইয়া গেল। নীলকমল উঠিয়া ঘিয়ের দীপ জ্বালিয়া দিয়া সব খোক্কস কাটিয়া ফেলিলেন। সকলের বড় খোক্কসটা নীলকমলের হাতে পড়িয়া, যেন, গিরগিটির ছা!

খোক্কস মারিয়া হাত মুখ ধুইয়া দুই ভাইয়ে নিশ্চিতে ঘুমাইতে লাগিলেন।

পরদিন রাজা গিয়া দেখিলেন, দুই রাজপুত্র রক্তজবার ফুল-গলাগলি হইয়া ঘুমাইতেছেন; চারিদিকে মরা খোক্কসরে গাদা। দেখিয়া রাজা ধন্যধন্য করিলেন। রাজার রাজত্ব ও জোড়া রাজ - কন্যা দুই ভাইয়ের হইল।

(৬)

সেই যে রাক্ষসী- রাণী? রাজার পুরীতে থানা দিয়া বসিয়াছে তো? আই - রাক্ষস কাই - রাক্ষস তাঁর দুই দূত দিয়া খোক্কসের মরণ - কথার খবর দিল। শুনিয়া রাসী - রাণী হাঁড়িমুখ ভারি করিয়া বুকে তিন চাপড় মারিয়া বলিল, – " আই রে! কাই রে ! আমি তো আর নাই রে -!

–ছাই পেটের বিষ- বড়ি
সাত জন্ম পরাণের অরি –
ঝাড়ে বংশে উচ্ছন্ন দিয়া আয়! "

অমনি আই কাই, দুই সিপাইর মূর্তি ধরিয়া নীলকমল লালকমল রাজসভায় গিয়া বলিল, – "বুকে খিল পিটে খিল, রাক্ষসের মাথায় তেল না হইলে তো আমাদের রাজার ব্যারাম সারে না। "

লালকমল নীলকমল কহিলেন, – " আচ্ছা, তেল আনিয়া দিব।"

নূতন তরোয়ালে ধার দিয়া, দুই ভাই রাক্ষসের দেশের উদ্দেশে চলিলেন।

যাইতে যাইতে, দুই ভাই এক বনের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইলেন। খুব বড় এক অশ্বত্থ গাছ হায়রাগ হইয়া দুই ভাইয়ে অশ্বত্থের তলায় বসিলেন।

সেই অশ্বত্থ গাছে বেঙ্গমা- বেঙ্গমী পীর বাসা। বেঙ্গমী বেঙ্গমাকে বলিতেছে, –

“আহ, এমন দয়াল কাঁরা, দুই ফোঁটা রক্ত দিয়া আমার বাছাদের চোখ ফুটায়! ”

শুনিয়া, লাল নীল বলিলেন, – “ গাছের উপরে কে কথা কয়?- রক্ত আমরা দিতে পারি।”

বেঙ্গমী “আহ্ আহা ” করিল।
বেঙ্গম নিচে নামিয়া আসিল।
দুই ভাই আঙ্গুল চিবিয়া রক্ত দিলেন।

রক্ত নিয়া বেঙ্গম বাসায় গেল; একটু পরে সাঁ সোঁ করিয়া দুই বেঙ্গম বাচ্চা নামিয়া আসিয়া বলিল, – “ কে তোমরা রাজপুত্র আমাদের চোখ ফুটাইয়াছ? আমরা তোমাদের কি কা করিব বল। ”

নীল লাল বলিলেন, – “আহা, তোমরা বেঁচে থাক: এখন আমাদের কোনই কাজ নাই। ”

বেঙ্গম- বাচ্চারা বলিল, – “আচ্ছা, তা তোমরা, যাইবে কোথায় চল, আমরা পিঠে করিয়া রাখিয়া আসি। ”

দেখিতে দেখিতে ডাঙ্গা জাঙ্গাল, নদ নদী, পাহাড়পর্বত -, মেঘ, আকাশ, চন্দ্র, সূর্য সকল ছাড়াইয়া, দুই রাজপুত্র পিঠে বাচ্চারা হু হু করিয়া শূন্যে উড়িল।

হু হু করিয়া শূন্যে উড়িল

(৭)

শূন্যে শূন্যে সাত দিন সাত রাত্রি উড়িয়া আট দিনের দিন বাচ্চারা এক পাহাড়ের উপর নামিল। পাহাড়ের নিচে ময়দান, ময়দান ছাড়াইলেই রাক্ষসের দেশ। নীলকমল গোটাকতর কলাই কুড়াইয়া লালকমলের কোঁচড়ে দিয়া বলিলেন, – "লোহার কলাই চিবাইতে বলিলে এই কলাই চিবাইও!"

নীল লাল আবার চলিতে লাগিলেন।

দুই ভাই ময়দান পার হইয়া আসিয়াছেন—, আর—,

"হাঁউ মাঁউ! কাউঁ !
মনিষ্যির গঁন্ধ পাঁউ!!
ধঁরে ধঁরে খাঁউ!!!"

–করিতে করিতে পালে পালে ‘ অযুতে- নিযুতে রাক্ষস ছুটিয়া ছুটিয়া আসিতে লাগিল। নীলকমল চেঁচাইয়া বলিলেন, – “ আয়ী মা! আয়ী মা ! আমরাই আসিয়াছি - তোমার নীলকমল, কোলে করিয়া নিয়া যাও ! ”

“বঁটে বঁটে, থাঁম্ থাঁম্! ” বলিয়া রাসদিগকে থামাইয় এ- ই লম্বা লম্বা হাত পা ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে, ঝাঁকার জট কাঁপাইতে কাঁপাইতে, হাঁপাইয়া ‘জটবিজটি ’ আয়ীবুড়ি আসিয়া নীলকমলকে কোলে নিয়া- “ আমার নীল! আমরা নাঁতু ! ’ বলিয়া আদর করিতে লাগিল। আয়ীর গায়ের গন্ধে নীলুর নাড়ি উলটিয়া আসে। লালকে দেখিয়া আয়ীবুড়ি বলিল, – “ওঁ’ তোঁর সঁঙ্গে কেঁ র‍্যাঁ? ”

নীলু বলিলেন, – “ও আমার ভাই লো আয়ীমা, ভাই! ”

বুড়ি বলিল, –

“তাঁ কেঁন মঁনিষ্যি মঁনিষ্যি গন্ধ পাঁই?
আঁমার নাঁতু হঁয় তো চিবিয়ে খাঁক্
নোঁহার কঁলাই।”

- বলিয়া বুড়ি 'হোঁৎ' করিয়া নাকে ভিতর হইতে পাঁচ গন্ডা লোহার কলাই বাহির করিয়া লাল- নাতুকে খাইতে দিল।

লাল তো আগেই জানেন; – চুপে চুপে লোহার কলাই কোঁচড়ে পুরিয়া, কোঁচড়ের সত্যিকার কলাই কটর্ কটর্ করিয়া চিবাইলেন! বুড়ি দেখিল, সত্যি তো, লাল টুক্টুক্ নাতুই তো। বুড়ি তখন গদগদ্, –দুই নাতু কোলে নিয়া বুলায়, ঢুলায়, কয়-

"আঁইয়া মাঁইয়া নাঁতুর
লাঁলু নীলু কাঁতুর্
নাঁতুর বাঁলাই দূরে যাঁ! "

- কিন্তু লালকমলের শরীরে মনুষ্যের গন্ধ-! কোটর চোক অস্গস্ জিভ বার বার খস্ - খস্, আয়ীর মুখের সাত কলস লাল্ গলিল ! তা নাতু? তা' কি খাওয়া যায়? বুড়ি কুয়োমুখে লাড় টুকু খাইতে খাইতে খাইল না। শেষে নাঁতু নিয়া আয়ী বাড়ি গেল

(৮)

সে কি পুরী! – রাজ্যজোড়া। সেই 'অছিন অভিন্ ' পুরী রাক্ষসে কিল্বিল্। যত রাক্ষসে পৃথিবী ছাঁকিয়া জীবজন্তু মারিয়া আনিয়া পুরী ভরিয়া ফেলিয়াছ। লাল নীল, রাক্ষসের কাঁধে চড়িয়া বেড়ান আর দেখেন, – গাদায় গাদায় মরা, গাদায় গাদায় জরা! পচায়, গলায় পুরী গদ্ গদ্ থক্ থক্ – গন্ধে বালো ভূত পালায়, দেব দৈত্য ডরায়! দেখিয়া লাল বলিলেন, –" ভাই, পৃথিবী তো উজাড় হইল। "

জীয়নকাটি–মরণকাটি

নীল চুপ করিয়া রহিলেন, –" নাঃ পৃথিবী আর থাকে না! ' তখন, নিশি রাত্রে, যত নিশাচর রাক্ষস, সাত সমুদ্রের ঐ পারে যত রাজ- রাজ্য উজাড় দিতে গিয়াছে; এক কাচ্চা - বাচ্চাও পুরীতে নাই; নীলকমল উঠিয়া, লালকমলকে নিয়া পুরীর দক্ষিণ কূয়োর পাড়ে গেলেন। গিয়া, নীল বলিলেন, –"দাদা, আমার কাপড়- চোপড় ধর।"

কাপড় দিয়া, নাল, কূয়োয় নামিয়া এক খড়্গ আর এক সোনার কৌটা তুলিলেন। কৌটা খুলিতেই জীয়নকাটি মরণকাটি দুই ভীমরুল ভীমরুলী বাহির হইল।

জীয়নকাটি মরণকাটি – ভীররুল ভীমরুলীর, গায়ে বাতাস লাগিতেই, মাথা কন্- কন্ বুক চন্ - চন্, রাক্ষসের মাথায় টনক্ পড়িল; বোকা রাজার দেশে রাক্ষসী - রাণী ঘুমের চোখে ঢুলিয়া পড়িল।

মাথার টনক্ বুকে চমক্; দীঘল দীঘল পায়ে রাক্ষসেরা নদী পবর্ত এড়ায়, ধাইয়া ধাইয়া আসে! দেখিয়া নীলকমল জীয়নকাটির পা ছিঁড়িয়া দিলেন। যত রাক্ষসের দুই পা খসিয়া পড়িল।

দুই হাতে ভর, তবু রাক্ষস ছুটিয়া ছুটিয়া আসে- নীলকমল জীয়নকাটির আর চার পা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। যত রাক্ষসের হাত

খসিয়া পড়িল
হাত নাই পা নাই, তবু রাক্ষস, –

“হাঁউ মাঁউ কাঁউ!
সাঁত শঁত্তুর খাঁউ -!! ”

–বলিয়া পড়াইয়া গড়াইয়া ছোটে। খড়গের ধারে ধরিয়া নীলকমল জীয়নকাটির মাথা কাটিলেন। আর যত রাক্ষসের মাথা ছুটিয়া পড়িল। আয়ীবুড়ির মাথাটা, – ছিটকাইয়া পড়িয়া নীল লালকে ধরে- ধরে গিলে - গিলে।

তখন রাক্ষস- পুরী খাঁ খাঁ; – আর কে থাকে? নীলকমল লালকমল আয়ীবুড়ির মাথা নূতন কাপড়ে জড়াইয়া, মরণকাটি ভীমরুলের সোনার কৌটা নিয়া, “বেঙ্গম, বেঙ্গম! ” - বলিয়া ডাক দিলেন।

(৯)

তিন মাস তের রাত্রির পর দুই ভাইয়ের পা দেশে পড়িল। দেশের সকলে জয় জয় করিয়া উঠিল!

নীলকমল লালকমল বলিলেন, – “সিপাইরা কৈ? ওষুধ নাও!”

সিপাইরা কি আছে? আই আর কাই তো রাক্ষস ছিল! তারা সেইদিন - ই মরিয়াছে। নীলকমল লালকমল আপন সিপাই বুকে খিল পিঠে খিল রাজার দেশে রাসের মাথা পাঠাইয়া দিলেন।

–"ও—মা!"

"ও- মা !!" - মাথা দেখিয়াই রাণী - নিজ মূর্তি ধারণ করিল—

"করম্ খাম্ গরম খাম্
মুড়মুড়িয়ে হাড্ডি খাম্!
হম্ ধম্ ধম্ চিতার আগুন
তবে বুকের জ্বালা যাম্ !!

বলিয়া রাক্ষসী- রাণী বিকট মূর্তি ধরিয়া ছুটিতে ছুটিতে নীলকমল লালকমলের রাজ্যে গিয়া উপস্থিত হইল।

বাহির দুয়ারে, –" খাম্! খাম্ !! "

লাল বলিলেন, –" থাম্ থাম্। " লালকমল মরণকাটি ভীমরুল আনিয়া- কৌটা খুলিলেন।

গা ফুলিয়া ঢোল,
চোখের দৃষ্টি ঘোল,

মরণকাটি দেখিয়া, রাক্ষসী, মরিয়া পড়িয়া গেল!

সকলে আসিয়া দেখে, – এটা আবার কি! খোক্কসের ঠাকুর 'মা না কি? আমাদের রাজ্যে বুঝি নিমন্ত্রণ খাইতে আসিয়াছেন? সকলে " হো- হো - হো !! " করিয়া উঠিল।

জল্লাদেরা আসিয়া মরা রাক্ষসিটাকে ফেলিয়া দিল।

(১০)

রাণী মরিল, আর বোকা রাজার রোগ সারিয়া গেল! ভাল হইয়া রাজা রাজ্যে রাজ্যে ঢোল দিলেন।

প্রজারা আসিয়া বলিল, – "হায়! আমাদের সোনার রাজপুত্র অজিত কুসুম কৈ?"

রাজা নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, – "হায়! অজিত কুসুম কৈ? "

এমন সময় রাজপুরীর ঢাক ঢোলের শব্দ। রাজা বলিলেন, – " দেখ তো, কি।"

গলাগলি দুই রাজপুত্র আসিয়া রাজার গায়ে প্রণাম করিল। রাজা বলিলেন, – "তোরা কি আমার অজিত কুসুম? "

প্রজারা সকলে বলিল, –"ইহারাই আমাদের অজিত কুসুম!"

তখন দুই রাজ্য এক হইল; নীলকমল লালকমল ইলাবতী লীলাবতীকে লইয়া, দুই রাজা সুখে কাল কাটাইতে লাগিলেন।

ডালিম কুমার

(১)

এক রাজা, রাজার এক রাণী, এক রাজপুত্র। রাণীর আয়ু একজোড়া পাশার মধ্যে,–রাজপুরীর তালগাছে এক রাক্ষসী এই কথা জানিত। কিন্তু কিছুতেই রাক্ষসী যো পাইয়া উঠে নাই। একদিন রাজা মৃগয়ায় গিয়াছেন, রাজপুত্র সখা সাথী পাঁচজন লইয়া পাশা খেলিতেছিলেন; দেখিয়া, রাক্ষসী, এক ভিখারিণী সাজিয়া রাজপুত্রের কাছে গিয়া পাশা জোড়া চাহিল; রাজপুত্র কি জানেন? হেলায় পাশা জোড়া ভিখারিণীকে দিয়া ফেলিলেন। তিন ফুঁয়ে রাক্ষসী, রাণীর আয়ু পাশা, কোন্ রাজ্যে পাঠাইল কে জানে? রাণীর ঘরে রাণী মূর্ছা গেলেন! রাক্ষসী তাড়াতাড়ি গিয়া রাণীকে খাইয়া রাণীর মূর্তি ধরিয়া বসিয়া রহিল।

রোজ যেমন, আজও রাজা আসিলেন–রোজ যেমন, আজও রাণী সেবা যত্ন করিলেন। কেবল রাজপুত্র দেখিলেন, খাবার দিবার সময়, মায়ের জিভের একফোঁটা জল টস্ করিয়া পড়িল! গা ছম্ ছম্ ! রাজপুত্র আর খাইলেন না; চুপ করিয়া উঠিয়া গেলেন। এ কথা আর কেহই জানিল না।

ক’ বৎসর যায়, রাজার সাত ছেলে হইল। রাজা খুব ধূমধাম করিলেন। কেবল রাজপুত্র দেখিলেন, তালগাছের আগা দিন দিন শুকায়, তালগাছে কোন পক্ষী বসে না। রাজপুত্র চুপ করিয়া রহিলেন।

সাত ছেলে বড় হইল। রাজা সময়মত তাহাদের অন্নপ্রাশন, চূড়া, উপনয়ন, সব করাইলেন। তখন রাজপুত্রেরা বলিলেন,–‘‘এখন আমরা দেশ ভ্রমণে যাইব।’’

রাজা বলিলেন,–‘‘বড়কুমার গেল না, তোরা কি করিয়া যাইবি?’’ রাজা বড়কুমারকে খবর দিলেন।

খবর পাইয়াই এক পক্ষিরাজে চড়িয়া বড়কুমার ভাইদের কাছে গেলেন, –‘‘কেন রে ভাই! দাদাকে তোরা ভুলিয়া গিয়াছিলি ? চল্, এইবার দেশ ভ্রমণে যাইব।’’ আট ভাই সাজ- সজ্জা করিয়া চরকটক সঙ্গে রাজপুরী হইতে বাহির হইলেন।

ছাদের উপরে রাক্ষসী রাণী দেখে,–বড় বিপদ,–কুমার তো গেল! আছাড়ি- বিছাড়ি রাক্ষসী ঘরে গিয়া এক কৌটা খুলিল; কৌটার মধ্যে সূতাশঙ্খ- সাপ। রাক্ষসী বলিল,–

‘‘সূতাশঙ্খ, সূতাশঙ্খ শাঁখের আওয়াজ!
কুমারের আয়ু কিসে বল দেখি আজ?’’

সূতাশঙ্খ সূতার মত ছোট্ট- সরু; কিন্তু আওয়াজ তা’র শঙ্খের মত। সরু ফণা তুলিয়া শঙ্খের আওয়াজে সূতাশঙ্খ বলিল –

‘‘তোর আয়ু কিসে রাণী, মোর আয়ু কিসে ?
ডালিম কুমারের আয়ু ডালিমের বীজে।’’

রাক্ষসী বলিল,–

“যাও ওরে সূতাশঙ্খ, বাতাসে করি ভর,–
যম- যমুনার রাজ্য- শেষে পাশাবতীর ঘর!
এই লিখন দিও নিয়া পাশাবতীর ঠাঁই,
সাত ছেলের তরে আমার সাত কন্যা চাই।
রিপু অরি যায়, সূতা, চিবিয়ে খাবে তারে,
সতীনের পুত যেন পাশা আনতে নারে।”

লিখন নিয়া, সূতাশঙ্খ, বাতাসে ভর দিয়া গাছের উপর দিয়া- দিয়া চলিল!

রাক্ষসী, এক ডালিম হাতে, আবার মন্ত্র পড়িল–

“পক্ষিরাজ, পক্ষিরাজ, উঠে চলে যা,
পাশাবতীর রাজ্যে গিয়া ঘাস জল খা।”

মন্ত্র পড়িয়া রাক্ষসী তাড়াতাড়ি আসিয়া রাজপুরীর হাজার সিঁড়ির ধাপে উঠিয়া বলিল, –“সিঁড়ি, তুমি কা’র?”

সিঁড়ি বলিল, –“যে যখন যায়, তা’র!”

রাক্ষসী বলিল,– “তবে সিঁড়ি, দু’ফাঁক হও, এই ডালিমের বীজ তোমার ফাটলে থা’ক।” ডালিমের বীজ হাজার সিঁড়ির ধাপের নীচে জন্মের মত বন্ধ হইয়া রহিল;– রাক্ষসী গিয়া নিশ্চিন্তে দুধ- ধব্- ধব্ শয্যায় শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

অমনি,–আট রাজপুত্র কোন্ বনের মধ্যে পড়িয়া ছিলেন, সেইখানে খটাস্ করিয়া বড়কুমারের চোখ অন্ধ হইয়া গেল, – বড়কুমার চীৎকার করিয়া উঠিলেন, –"ভাই রে! বিছার কামড়, – গেলাম গেলাম!!"

সূর্য ডুবিয়া গেল, চারিদিকে ঝড় বৃষ্টি, অন্ধকার,–বনের মধ্যে কিছু দেখা যায় না, শোনা যায় না, বড় রাজকুমার কোথায় পড়িয়া রহিলেন, চরকটক কোথায় গেল–সাত রাজপুত্রের ঘোড়া ঝড়ের আগে ছুটিয়া চলিল

(২)

রাক্ষসী তো স্বপ্ন দেখে,–সূতাশঙ্খ এতক্ষণে যম- যমুনা দেশের 'সে পার'! ওদিকে সূতাশঙ্খ সারাদিন গাছে গাছে চলিয়া, হায়রাণ; একখানে রাত্রি হইল, কে আর যায় ? পরিপাটী রাজার বাগান,– বাগানের এক গাছের ফলের মধ্যে ঢুকিয়া, বেশ করিয়া কু- লী মণ্ডলী পাকাইয়া, সূতা ঘুমাইয়া রহিল।

রাজকন্যা রোজ সেই গাছের ফল খান। মালী নিত্যকার মত ফল আনিয়া দিল; রাজকন্যা নিত্যকার মত ফলটি খাইলেন।–ফলের সঙ্গে সূতাশঙ্খ, রাক্ষসীর লিখন, রাজকন্যার পেটে গেল।

লিখন টিখন ওসব কথা রাজপুত্রেরা কি জানে ? উড়িয়া, ছুটিয়া, পক্ষিরাজেরা যে কোথা' দিয়া কি করিয়া গেল, কেহই জানে না। একখানে গিয়া ভোর হইল; সকলে দেখেন,–দাদা নাই! ভাবিলেন,

পাছে পড়িয়া গিয়াছেন! রাশ আল্গা দিয়া সাত ভাই দাদার জন্য পক্ষিরাজ থামাইলেন।

নাঃ,–দিন যায়, রাত যায়, দাদার দেখা নাই! তখন, এক ভাই বলিলেন,–"ঘোড়া যদি আগে গিয়া থাকে!"

"ঠিক্, ঠিক্!!" সকলে পক্ষিরাজ সামনে ছুটাইয়া দিলেন।

মন্ত্র- পড়া পক্ষিরাজ একেবারে পাশবতীর পুরে গিয়া উপস্থিত!

পাশাবতীর পুরে পাশাবতী দুয়ারে নিশান উড়াইয়া ঘর- কুঠরী সাজাইয়া, সাজিয়া, বসিয়া আছে। যে আসিয়া পাশা খেলিয়া হারাইতে পারিবে, আপনি, আপনার ছয় বোন নিয়া তাহাকে বরণ করিবে। রাজপুত্রদিগকে দেখিয়া পাশাবতী বলিল, - "কে তোমরা?"

রাজপুত্রেরা বলিলেন,–"অমুক দেশের রাজপুত্র, দেশ ভ্রমণে আসিয়াছি।"

পাশাবতী বলিল,– "না! দেখিয়া বোধ হয় যক্ষ রক্ষ।–তোমরা আমার পণ জান?"

"জানি না।"

"আমার পাশার পণ।–দানব যক্ষ রক্ষ হইলে পরখ্ দেখিয়া নিব; মানুষ হইলে খেলিতে হইবে।

যে দিনে সে মালা পায়,
হারিলে মোদের পেটে যায়!”

রাজপুত্রেরা বলিলেন,–‘পরখ্ কর!”

পাশাবতী লিখন দেখিতে চাহিল,–“দানব যক্ষ রক্ষ হইলে লিখন থাকিবে।

রাজপুত্রেরা বলিলেন,–“লিখন কিসের ? লিখন নাই।”
“তবে খেল।”

খেলিয়া রাজপুত্রেরা হারিয়া গেলেন। পাশাবতীর সাত বোনে সাত রাজপুত্র, পক্ষিরাজ সব কুচিকুচি করিয়া কাটিয়া হালুম হালুম করিয়া খাইয়া ফেলিল। ফেলিয়া, আবার রূপসী মূর্তি ধরিয়া বসিয়া রহিল। রাক্ষসী- রাণী স্বপ্ন দেখে কি, আর তা'র কপালে হইল কি! রাক্ষসীর মাথায় টনক্ পড়িয়াছে কিনা, কে জানে ? যা'ক্!

(৩)

অন্ধ রাজকুমারকে পিঠে করিয়া পক্ষিরাজ ঝড়- বৃষ্টি অন্ধকারে শূন্যের উপর দিয়া ছুটিতে ছুটিতে,–হাতের রাশ হারাইয়া রাজকুমার কখন্ কোথায় পড়িয়া গেলেন। পক্ষিরাজ এক পাহাড়ের উপর পড়িয়া পাথর হইয়া রহিল।

রাজকুমার যেখানে পড়িলেন, সে এক নগর! সেই নগরে রাজপুরীতে সন্ধ্যার পর লক্ষ কাড়া, লক্ষ সানাই, ঢাক ঢোল সব

বাজিয়া উঠে, ঘরে ঘরে চূড়ায় চূড়ায় পথে পথে মশাল জ্বলে, নিশান উড়ে, হৈ হৈ আনন্দের সাড়া পড়িয়া যায়।

ভোরে সব চুপ! তারপর কেবল কান্নাকাটি, চীৎকার, হাহাকার, বুকে চাপড়, ছুটাছুটি–চোখের জলে দেশ ভাসে, শোকে রাজ্য আচ্ছন্ন হইয়া যায়।

আবার, দুপুর বহিয়া গেলে, যখন রাজার হাতী সাজিয়া গুজিয়া বাহির হয়, তখন রাজ্যের লোক নিঃশ্বাস ছাড়িয়া গিয়া খাওয়া দাওয়া করে,–তাহার পর সমস্ত নগরের লোক পথে পথে সারি দিয়া দাঁড়ায়।

পাট হাতী ছোটে, ছোটে,–একজনকে ধরিয়া, সিংহাসনে তুলিয়া নেয়–অমনি ঢাক ঢোল বাজাইয়া শাঁকে ফুঁ দিয়া সিপাই, সান্ত্রী, মন্ত্রী, অমাত্য সকলে তুলিয়া- নেওয়া মানুষকে লইয়া গিয়া রাজ্যের রাজা করে। রাজকন্যার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়।–আবার আনন্দের হাট বসে।

পরদিন দেখা যায় রাজকন্যার ঘরে কেবল হাড় গোড়; রাজার চিহ্নও নাই!! এই রকমে কত রাজা হইল, কত রাজা গেল। কিন্তু রাজা না থাকিলে রাজ্য থাকে না; তাই নিত্য নূতন রাজা চাই ! রাজকন্যা জানেন না, কেহই বুঝিতে পারে না, রাজাকে কিসে খায় !

পাটহাতী ছুটিয়াছে। নগরে ‘‘সার্ সার্’’ সোর পড়িয়া গিয়াছে; সকলে চীৎকার করিতেছে, ‘‘পথ ছাড়, পথ ছাড়, কাতার দাও।’’

রাজকুমারের জ্ঞান হইয়াছে, শব্দ শুনিয়া রাজকুমার উঠিয়া বসিলেন,–কিসের পথ, কোথায় আসিয়াছেন, রাজপুত্র কিছুই জানেন না, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না; রাজপুত্র থতমত খাইয়া রহিলেন।

হাতী কাতারের কাহাকেও ছুঁইল না;–হু হু করিয়া সকল পথ ছাড়াইয়া আসিয়া রাজপুত্রকে তুলিয়া সিংহাসনে বসাইল। রাজ্যের লোক "রাজা! রাজা!" বলিয়া জয়- জয়কার দিয়া অন্ধ রাজকুমারকে নিয়া রাজা করিল।

ধূমধাম, অভিষেক, জাঁকজমক, বিচার আচার, সভা, দরবার–সব–শেষে রাত্রি-রাজার দেশে সব ঘুমাইয়াছে। নগরে শহরে সাড়াটি নাই, দুয়ার দরজায় পাহারা নাই–থাকিয়া কি হইবে? কা'ল যা' হইবে সকলেই তো তা' জানে, পাহারারা আর পাহারা দেয় না! রাজকন্যা ঘুমে বিভোর।

সেই কালরাত্রে কেবল রাজকুমার জাগিয়া আছেন। ঘর বা'র নিঝুম, পৃথিবী- সংসারে টুঁ শব্দ নাই,– পোকা- মাকড় পক্ষী টিও ডাকে না;–কাল্ নিশির কালঘুমে সব যেন ছাইয়া আছে।

ঘরে প্রদীপ দপ্ দপ্, রাজপুত্রের মন–ছব্ ছব্; কোনই সাড়া নাই–কোনই শব্দ নাই।

হঠাৎ ঘুমের মধ্যে রাজকন্যা চীৎকার করিয়া অজ্ঞান হইলেন; চিড়িক দিয়া ঘরে বিজলী জ্বলিয়া উঠিল, চড়্ চড়্ করিয়া দেওয়ালের গা ফাটিয়া গেল; চুর্ চুর্ ঝুর্ ঝুর্ চারিদিকে ঝালর- পাত খসিয়া পড়িতে লাগিল।–রাজপুত্রের সকল গা কাঁটা–শক্ত করিয়া

তরোয়ালের মুঠি ধরিয়া হাঁটু গাড়িয়া রাজকুমার বলিলেন, ‘‘কে?’’ রাজপুত্র কিছুই দেখিতে পান না; ঘরের আলো, বিদ্যুতের চমক,– রাজকন্যার শরীর কাঠের মত শক্ত,–রাজকন্যার নাকের ভিতর হইতে সরু–মিহি– চুলের মত সাপ বাহির হইল! সেই চুল দেখিতে দেখিতে সূতা– দড়া,– কাছি, তারপর প্রকাণ্ড অজগর! শঙ্খের মত আওয়াজে সেই অজগর গর্জিয়া উঠিল।

“যক্ষ হও রক্ষ হও তলোয়ার তোমাকে ছুঁইবে!”

পুরী থর্ থর্ কাঁপে! হাতের তরোয়াল ঝন্ ঝন্–রাজপুত্র হাঁকিলেন–‘‘জানি না,–যে হও তুমি, যক্ষ রক্ষ দানব!- যদি রাজপুত্র হই, যদি নিষ্পাপ শরীর হয়, দৃষ্টির আড়ালে তরোয়াল ঘুরাইলাম, এই তরোয়াল তোমাকে ছুঁইবে!’’

বলা আর কহা,–সূতাশঙ্খ বত্রিশ ফণা ছড়াইয়া বিষদাঁতে আগুন ছুটাইয়া লক্লক্ করিয়া উঠিয়াছে,–রাজপুত্রের তরোয়াল ঝ- ঝন্- ঝন্ শব্দে ঘরের ঝাড়বাতি চূর্ণ করিয়া সূতাশঙ্খের বত্রিশ ফণায় গিয়া লাগিল! অমনি রাজপুত্র দেখেন,–সাপ! ঘরময় বিদ্যুতের ধাঁধাঁ, চারিদিকে ধোঁয়া!–রাজপুত্র শন্শন্ তরোয়াল ঘুরাইয়া বলিলেন,–‘‘চক্ষু পাইলাম !!!’’ তরোয়ালে অজগর সাত খণ্ড হইয়া কাটিয়া গেল; সেই নিশিতে রাক্ষসী- রাণীর পুরীতে ধ- ধ্বড়্- ধ্বড়্ শব্দে হাজার সিঁড়ির ধাপ ধ্বসিয়া গেল, রাজকুমারের আয়ু সহস্রডাল সোনার ডালিম গাছ হইয়া গজাইয়া উঠিল। রাজপুরীতে ভূমিকম্প- গুড়্- গুড়্ দুড়্- দুড়্ শব্দ! ভয়ে রাক্ষসী ইঁদুর হইয়া ‘‘চিচি’’ করিতে করিতে ছুটিয়া পলাইয়া গেল। রাণীর

শরীর আবার মূর্চ্ছা গিয়া পড়িয়া রহিল। রাজ্যে রাজপুরীতে হাহাকার,–"এ সব কি!"

রাত-রাজার রাজ্যের লোক নিত্যকার মত কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়াছে–দেখে–ধন্য! ধন্য!– রাজা! রাজা আজ জীয়ন্ত !!! লোকের আনন্দ ধরে না! দেখে হাজারো ফণা সাত কুচি সাপ–মেজেতে পড়িয়া!! ''কি সর্বনাশ!''–সকলে বুঝিল, এই সাপে এত দিন এত রাজা খাইয়াছে!–''সাপকে পোড়াও।''

পোড়াইতে গিয়া, সাপের পেটে লিখন! লিখন রাজার কাছে আসিল। পড়িয়া রাজপুত্র বলিলেন,–''রাজকন্যা! আর তো আমি থাকিতে পারি না– আমার সাত ভাই বুঝি রাক্ষসের পেটে গিয়াছে!- আমি চলিলাম!'' রাজ্যের লোক মনঃক্ষুণ্ন– ''শেষে এক রাজা পাইলাম তিনিও কোথায় চলিলেন।'' রাজা কবে ফিরিবেন,–সকলে পথ চাহিয়া রহিল।

ডালিমকুমার যাইতেছেন, যাইতেছেন, এক পাহাড়ে উঠিয়া দেখেন পক্ষিরাজ। ছুঁইতেই আবার প্রাণ পাইয়া পক্ষিরাজ, ''চিঁহী হিঁ!'' করিয়া উঠিল। রাজপুত্র বলিলেন,–''পক্ষিরাজ, এইবার চল।''

যম-যমুনার দেশ- অন্ধকার গায়ে ঠেক, বাতাসে পাথর উড়ে, রাজপুত্র কিছুই মানিলেন না- 'ঝড়ের গতি কোন্ ছার, পক্ষিরাজে আসন যা'র।' তীর- বজ্রের মত পক্ষিরাজ ছুটিয়া চলিল।

কতক দূরে গিয়া কড়ির পাহাড়। কড়ির পাহাড়ে পক্ষিরাজের পা চলে না; ছটফট্ রটারট্ শব্দ। রাজপুত্র বলিলেন, –''পক্ষি! থামিও না;

ছুটে’ চল।’’ পক্ষিরাজ তীর-বজ্রের গতি–সারারাত্রি পায়ের নীচে কড়ির পাহাড় চূর হইয়া গেল। তার পরেই হাড়ের পাহাড়। হাড়ের পাহাড়ের নীচে কলকল শব্দে রক্ত নদীর জল তোড়ে ছুটিয়াছে; রক্তের তরঙ্গ, রক্তের ঢেউ! দাঁত বাহির করিয়া মড়ার মুণ্ড “হী! হী!” করিয়া উঠে, হাড়ে হাড়ে কটাকট খটাখট শব্দ, – কান পাতা যায় না। রাজপুত্র বলিলেন, – “পক্ষি! ভয় নাই, চোখ বুজিয়া চল।’’ পায়ের নীচে হাড়ের পাহাড় খট্-খট্-খটাং, ছর্-র্-র্-র্-ছটছট্ শব্দে তুষ হইয়া গেল। তখন রাত্রি পোহাইল, রাজপুত্র দেখেন, দূরে পাশাবতীর পুর। পাশাবতীর পুরে ফটকে নিশান; নিশানে লেখা আছে,–

“পাশা খেলিয়া যে হারাইবে, সাত বোনে মালা দিব!’’

রাজপুত্র হাঁকিলেন, –“পাশা খেলিব!’’

খেলিতে বসিয়া রাজপুত্র চমকিয়া গেলেন, – এ পাশা তো তাঁরি! খেলিতে গিয়া রাজপুত্র হারিয়া গেলেন, – দেখেন, এক ইঁদুর পাশা উল্টাইয়া দেয়। আনমন রাজপুত্র বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। পাশাবতী বলিল, –“রাজপুত্র! পণ ফেল।’’

“পক্ষিরাজ নাও; কাল আবার খেলিব।’’ বলিয়া রাজপুত্র উঠিয়া গেলেন। পাশাবতীরা তখনি পক্ষিরাজকে গরাসে গরাসে খাইয়া ফেলিল।

পরদিন এক গ্রামের মধ্যে গিয়া রাজপুত্র এক বিড়ালের ছানা নিয়া আসিলেন। বলিলেন, –“এস, আজ খেলিব।’’

ইঁদুর আসে-আসে,-পলায়

খেলিতে বসিয়াছেন–আজ ইঁদুর আসে- আসে করে, আসে না– কি যেন দেখিয়া পলায়।

রাজপুত্র দা'ন ফেলিলেন -

"এই হাতে ছিলে পাশা, পুনু এলে হাতে,–
এত দিন ছিলে পাশা–কা'র দুধ- ভাতে?"

আর দা'ন পড়ে। পলক ফেলিতে না ফেলিতে পাশাবতী হারিয়া গেল। রাজপুত্র বলিলেন, –"আমার পক্ষিরাজ দাও।"

রাক্ষসী পক্ষী রাজ দিল।

আবার খেলা। রাক্ষসী আবার হারিল; রাজপুত্র বলিলেন, – "আমার ঘোড়ার মত ঘোড়া, আমার মত রাজপুত্র দাও।" পাশাবতী এক রাজপুত্র এক ঘোড়া আনিয়া দিল; রাজপুত্র দেখেন, ভাই; ভাইয়ের ঘোড়া! রাজপুত্র আবার খেলিলেন। খেলিতে খেলিতে রাজপুত্র- সাত ভাই, সাত ভাইয়ের ঘোড়া, পাশাবতীর রাজ- রাজত্ব ঘর পুরী সব জিতিলেন। শেষে বলিলেন, –"এখন কি দিবে ? এই পাশা আর ইঁদুর দাও।" পাশাবতী কি পাশা অমনি দেয়?- তখন রাজপুত্র বিড়ালের ছানা ছাড়িয়া দিলেন,–বিড়াল গড়্ গড়্ করিয়া ইঁদুরকে ধরিয়া ছিঁড়িয়া খাইয়া ফেলিল। ঘরের প্রদীপ নিবিয়া গেল, –

রাজ- রাজত্ব কোথায় সব? হাতের পাশা হাতে, রাজপুত্র দেখেন– সাত পাশাবতী সাত কেঁচো হইয়া মরিয়া রহিয়াছে!

পাশা বলিল, –‘‘কুমার, কুমার ঘরে চল।’’

আট রাজপুত্র আট পক্ষিরাজ হু হু করিয়া ছুটাইয়া দিলেন।

রাজপুরীতে রাণী উঠিয়া বসিয়াছেন,–‘‘কতকাল ঘুমাইয়াছি!- আমার কুমার কৈ?’’

‘‘কুমার কৈ!’’–চারিদিকে জয়ঢাক বাজে, পথের ধূলায় অন্ধকার– আট রাজপুত্র আট পক্ষিরাজের সারি দিয়া রাজ্যে ফিরিয়াছেন। কুমার আসিয়া বলিলেন, –‘‘মা কৈ, মা কৈ?’’–আট রাজপুত্র রাণীকে ঘিরিয়া প্রণাম করিলেন। শূন্য পুরীতে আবার সোনার হাট মিলিল।

‘‘ভাইদের খোঁজে কবে গিয়াছেন, সবে- জীয়ন্ত এক রাজা আমাদের, আজও ফিরেন না।’’ খুঁজিয়া খুঁজিয়া রাত- রাজার দেশের যত লোক আসিয়া দেখিল,–‘‘আমাদের রাজা এইখানে!’’ তখন রাজকন্যা রাজপাট তুলিয়া সেইখানে নিয়া আসিলেন।

সকল দেখিয়া রাজা অবাক!

পরদিন ভোর বেলা সোনার ডালিম গাছে হাজার ফুল ফুটিয়া উঠিয়াছে;–আর দুপুর বেলা রাজপুরীর তালগাছটা, কিছুর মধ্যে কিছু না, শিকড় ছিঁড়িয়া দুম্ করিয়া পড়িয়া, ফাটিয়া চৌচির হইয়া গেল।

পাতাল- কন্যা মণিমালা

মণিমালা সাপের পরশ হিম

(১)

এক রাজপুত্র আর এক মন্ত্রিপুত্র–দুই বন্ধুতে দেশভ্রমণে গিয়াছেন। যাইতে, যাইতে, এক পাহাড়ের কাছে গিয়া... সন্ধ্যা হইল!

মন্ত্রিপুত্র বলিলেন,–"বন্ধু, পাহাড়- মুল্লুকে বড় বিপদ- আপদ; আইস, ঐ গাছের ডালে উঠিয়া কোন রকমে রাতটা কাটাইয়া দিই।"

রাজপুত্র বলিলেন, –"সেই ভাল।"

দুই জনে ঘোড়া বাঁধিয়া রাখিয়া, এক সরোবরের পাড়ে খুব উঁচু গাছের আগডালে উঠিয়া শুইয়া রহিলেন।

অনেক রাত্রে রাজপুত্র মন্ত্রিপুত্র কি- জানি কিসের এক ভয়ঙ্কর শব্দ শুনিয়া জাগিয়া দেখেন,–বনময় আলো!–সেই আলোতে ওরে বাপরে

বাপ্! রাজপুত্র মন্ত্রিপুত্রের গা- অঙ্গ ডোল হইল, গায়ে পায়ে কাঁটা দিল,–দেখেন,–আকাশ পাতালে গলা ঠেকাইয়া এক কাল্- অজগর তাঁহাদের ঘোড়া দুইটাকে আস্ত আস্ত গিলিয়া খাইতেছে ! অজগরের মুখে ঘোড়া ছটফট করিতেছে !

কাল্ অজগর

দেখিতে- দেখিতে ঘোড়া দুইটাকে গিলিয়া, যতদূর আলোকে দেখা যায়, অজগর, বনের পোকা- মাকড় খাইতে খাইতে ততদূর বেড়াইতে লাগিল।

রাজপুত্র থর্ থর্ কাঁপেন ! মন্ত্রিপুত্র চুপি- চুপি বলিলেন, –‘‘বন্ধু। ডরাইও না, ওই যে আলো, ওটি সাত- রাজার ধন ফণীর মণি, – মণিটি নিতে হইবে।’’

রাজপুত্র বলিলেন, –‘‘সর্বনাশ! কেমন করিয়া নিবে?’’

‘‘ভয় নাই, দেখ, আমি মণি আনিব।’’

বলিয়া, মন্ত্রিপুত্র, আস্তে আস্তে নামিয়া আসিয়াই এক খাবল কাদা আনিয়া মণির উপর ফেলিয়া দিলেন। দিয়াই আপনার তরোয়ালখানি কাদার উপর উল্টাইয়া রাখিয়া, সরসর্ করিয়া গাছে উঠিয়া গেলেন! সব অন্ধকার;–দুই জনে চুপ!

অজগর, তার মণি!–সেই মণির আলো নিভিয়াছে; অজগর, হোঁস্ হোঁস্ শোঁস শোঁস শব্দে ছুটিয়া আসিল; দেখে, মণি নাই ! অজগর তরোয়ালের উপর ফটাফট ছোবল মারিতে লাগিল।

কাদার তলে মণি নিখোঁজ–তরোয়ালের ধারে অজগরের ফণায় রক্তের বান। চোখে আগুনের হলক, মুখে বিষের ঝলক, অজগর পাগল হইয়া গেল।

কাল্- অজগর পাগল হইয়াছে,–সারা বনের গাছ মুড়মুড়্ করিয়া ভাঙ্গে, লেজের বাড়িতে সরোবরের জল শতখান হইয়া যায়। অবশেষে রাগে, দুঃখে, অজগর নিজের শরীর নিজে কামরাইয়া তরোয়ালে মাথা খুঁড়িয়া মরিয়া গেল।

থর্ থর্ করিয়া দুই বন্ধুর রাত পোহাইল। পরদিন রোদ উঠিলে, দুইজনে বেশ করিয়া দেখিলেন, যে, না–অজগর সত্যিই মরিয়াছে। তখন নামিয়া কাদামাখা মণি কুড়াইয়া দুই বন্ধু সরোবরে নামিলেন।

(২)

নামিতে নামিতে, দুই বন্ধু যতদূর যান, –জল কেবল দুই ভাগ হইয়া শুকাইয়া যায়! শেষে, মণির আলোতে দেখেন, পাতালপুরী পর্যন্ত এক পথ! দুইজনে চলিতে লাগিলেন।

খানিক দূর যাইতেই এক পরম সুন্দর অট্টালিকা। চারিদিকে ফুল- বাগান,–ফুলে ফুলে ছড়াছড়ি, লতায় লতায়, পাতায় পাতায় জড়াজড়ি। দুই বন্ধু অট্টালিকার মধ্যে গেলেন।

অট্টালিকার মধ্যে সোঁ সোঁ রোঁ রোঁ শব্দ। রাজপুত্র ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। মন্ত্রিপুত্র বলিলেন, –‘‘বন্ধু, ডরাইও না, মণি কাছে থাকিতে ভয় নাই।’’

লকলকে’ চকচকে’ কোটি রঙের কোটি সাপ ডিঙ্গাইয়া, সাপের উপর দিয়া হাঁটিয়া দুই জনে এক ঘরে গেলেন! সেখানে সাপের দেওয়াল, সাপের থাম, সাপের মেজে, সাপের কড়ি, সাপের মণির দেওয়ালগিরি, – লক্ষ সাপের শয্যায় মণিমালা রাজকন্যা নিশ্চিন্তে ঘুমাইতেছেন।

রাজপুত্র বলিলেন, –‘‘বন্ধু, এ- কি’’

মন্ত্রিপুত্র বলিলেন, –‘‘বন্ধু, দেখ, পাতালপুরীর পাতালকন্যা।’’

আশ্চর্য হইয়া,–রাজপুত্র দেখিতে লাগিলেন।

ধীরে ধীরে মন্ত্রিপুত্র মণিটি নিয়া মণিমালার কপালে ছোঁয়াইতেই মণিমালা জাগিয়া উঠিয়া বসিলেন। রাজপুত্র মন্ত্রিপুত্রকে দেখিয়া ত্রস্তে ব্যস্তে মণিমালা বলিলেন, –‘‘আপনারা কে? এ যে কাল্- অজগরের পুরী, আপনারা কেমন করিয়া এখানে আসিলেন!’’

মন্ত্রিপুত্র কহিলেন, –‘‘রাজকন্যা, ভয় নাই; কাল্- অজগরকে আমরা মারিয়া ফেলিয়াছি। এই রাজপুত্র তোমার বর।’’

রাজপুত্র মণিমালা দুইজনে, মাথা নীচু করিলেন।

হাসিয়া মন্ত্রিপুত্র মণিমালার গলার মালা রাজপুত্রের গলায় দিলেন, রাজপুত্রের গলার মালা মণিমালার গলায় দিলেন।

চারিদিকে লক্ষ সাপের ফণা হেলিয়া দুলিয়া উঠিল।

(৩)

সাপের পুরীতে পরম সুখে দিন যায়। কতক দিন পর, মন্ত্রিপুত্র বলিলেন, –‘‘বন্ধু, আমরা তো এখানে সুখেই আছি, দেশে কি হইল কে জানে! আমি যাই, পঞ্চকটক দোলা- বাদ্য সকলে নিয়া আসিয়া তোমাদি’কে বরণ করিয়া দেশে লইয়া যাইব।’’

রাজপুত্র বলিলেন, –‘‘আচ্ছা!’’

আবার সরোবরের পথে মণি দেখা দিল, মন্ত্রিপুত্র দেশে গেলেন। বন্ধুকে বিদায় দিয়া, মণি লইয়া রাজপুত্র ফিরিয়া আসিলেন।

দু’জনে আছেন। রাজপুত্র পৃথিবীর কত কথা মণিমালাকে বলেন, মণিমালা পাতালের যত কথা রাজপুত্রের কাছে বলেন। বলিতে বলিতে, একদিন মণিমালা বলিলেন, –‘‘জন্মে কখনো পৃথিবী দেখিলাম না, দেখিতে বড় সাধ যায়।’’

রাজপুত্র কিছু বলিলেন না।

দুপুরে রাজপুত্র শুইয়া আছেন। রাজপুত্রকে ঘুমে দেখিয়া মণিমালা ক্ষার খৈল গামছা নিয়া মণিটি হাতে সরোবরের পথে পৃথিবীতে উঠিলেন।–‘‘আহা! কি সুন্দর!’’ পৃথিবী দেখিয়া মণিমালা অবাক।

মণিমালা বলিলেন, ‘‘মণি, মণি! উজ্জ্বে’ ওঠ্, এই সরোবরের জলে আমি নাইব।’’

অমনি মণির আলো উজ্জ্বে’ উঠিল, সরোবরের মাঝখানে রাজহাঁসের থাক, শ্বেতপাথরের ধাপ, ধবধবে’ সুন্দর ঘাটলা হইল। মণিমালা ধাপের উপর মণি রাখিয়া, ক্ষার খৈল দিয়া গা- পা কচলাইতে লাগিলেন।

সেই সময় সেই দেশের রাজপুত্র সেই বনে শিকার করিতে আসিয়াছেন। তিনি সব দেখিলেন। দেখিয়াই রাজপুত্র চুটিয়া আসিয়া জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন।

চমকিয়া মণিমালা দেখেন, – মানুষ! মণি লইয়া মণিমালা ডুব দিলেন। চক্ষের পলকে সব কোথায় গেল!- রাজপুত্র ‘‘হায় হায়’’ করিতে করিতে ফিরিয়া গেলেন।

কাঠকুড়ানী পেঁচোর মা এক বুড়ী এই সব দেখিল। দেখিয়া বুড়ী চুপটি করিয়া রহিল।

(৪)

শিকারে গিয়া রাজপুত্র পাগল হইয়া আসিয়াছেন; কত ওষুধ বিষুধ, কিছুতেই রোগ সারে না; রাজা রাণী অধীর, রাজ্যের লোক অস্থির। অবশেষে রাজা ঢেঁটরা দিলেন, –‘‘রাজপুত্রকে যে ভাল করিতে পারিবে, অর্দ্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা তাকে দিব।’’ কে ঢেঁটরা ছুঁইবে? কেহই ছুঁইল না। শেষে পেঁচোর মা বুড়ী এই কথা

শুনিল। শুনিয়া বুড়ী উঠে কি পড়ে আছাড়ি- বিছাড়ি সাত তাড়াতাড়ি আসিয়া ঢেঁটরা ধরিল।

রাজার কাছে গিয়া বুড়ী বলিল, –“তা রাজামশাই, আমি তো ওষুধ জানি, –তা আমি বুড়ো হাবড়া মেয়েমানুষ, তা আমার পেঁচোর সঙ্গে যদি রাজকন্যার বিয়ে দাও, তো রাজপুত্রকে ওষুধ দি।”

রাজা তাহাই স্বীকার করিলেন।

তখন পেঁচোর মা বুড়ী একরাশ তুলা, এক চরকা নিয়া, পবনের নায়ে উঠিয়া বলিল, –

“ঘ্যাঁঘর্ চরকা ঘ্যাঁঘর্,
রাজপুত্র পাগল!
হটর্ হটর্ পবনের না’,
মণিমালার দেশে যা।”

হটর্ হটর্ পবনের না’

পবনের না’ মণিমালার দেশে গেল। বুড়ী সরোবরের কিনারে বসিয়া ঘ্যাঁঘর্ ঘ্যাঁঘর্ করিয়া চরকায় সূতা কাটিতে লাগিল।

আবার দুপুরে রাজপুত্র শুইয়াছেন; মণিমালা মণি নিয়া উঠিয়া আসিলেন, –“ও বুড়ী, বুড়ী, তুই কোথা’ থেকে’ এলি? আমাকে একখানা শাড়ী বুনিয়া দে।”

বুড়ী শাড়ী বুনিয়া দিয়া কড়ি চাহিল! মণিমালা বলিলেন, –“বুড়ী, কড়ি তো নাই, এই এক মণি আছে!”

বুড়ী বলিল–“তা, তা–তাই দাও।”

মণিমালা মণি দিতে গেলেন, বুড়ী খপ্ করিয়া মণিমালাকে পবনের নৌকায় উঠাইয়া বলিল–

“ঘ্যাঁঘর, চরকা ঘ্যাঁঘর,
রাজপুত্র পাগল!
হটর হটর পবনের না’,
রাজপুত্রের কাছে যা।”

আর কী? বুড়ী মণিমালাকে রাজপুরীতে দিয়া, মণিটি লুকাইয়া নিয়া বাড়ীতে গেল।

রাজপুত্র ভাল হইলেন! মণিমালার সঙ্গে তাঁহার বিয়ে ! পেঁচোর সঙ্গে রাজকন্যার বিবাহ হইবে কি না ? সাত বচ্ছর নিখোঁজ পেঁচোর জন্য বুড়ী দেশে দেশে লোক পাঠাইল।

মণিমালা বলিলেন,–“আমার এক বৎসর ব্রত, এক বৎসর পরে যা’ হয় হইবে।”

সকলে বলিলেন, –“আচ্ছা।”

মণি গেল, মণিমালা গেল, সাপের নিশাস গরল, সাপের পরশ হিম, আজ রাজপুত্র ঘুমে ঢুলু ঢুলু। ঢুলিয়া রাজপুত্র সাপের শয্যায় ঘুরিয়া পড়িলেন।

শিয়রের সাপ ফণা তুলিয়া গর্জিয়া উঠিল, আশের সাপ পাশের সাপ, গা-মোড়া দিয়া উঠিয়া রাজপুত্রকে আষ্টে-পিষ্ঠে জড়াইয়া ধরিল। নাগপাশের বাঁধনে রাজপুত্র সাপের শয্যায় বিষের ঘোরে অচেতন হইয়া রহিলেন।

(৫)

দোলা চৌদোলা পঞ্চকটক নিয়া সরোবরের পাড়ে আসিয়া মন্ত্রিপুত্র ডাকেন, –“বন্ধু! বন্ধু! পথ দেখাও।”

না, সাড়া শব্দ কিছুই নাই! দিনের পর দিন গেল, রাত্রির পর রাত্রি গেল, বন্ধু আর সাড়া দিল না। তখন মন্ত্রিপুত্র ভাবিত হইয়া, পঞ্চকটক বনে রাখিয়া, বাহির হইলেন।

খানিক দূর গেলে, পথের লোকেরা বলিল, –“কে-গো তুমি কা’র বাছা, পেঁচোকে দেখিয়াছ? পেঁচো রাজার জামাই হইবে, পেঁচোর মা বুড়ী পেঁচোর খোঁজে পথে পথে ঘুরে।”

মন্ত্রিপুত্র বলিলেন, –“হাঁ, হাঁ, আমি পেঁচোকে দেখিয়াছি; তা সে রাজত্ব রাজকন্যা পাইল কেন ?”

লোকেরা সকল কথা বলিল।

মন্ত্রিপুত্র বলিল, –“বেশ্ বেশ্! তা, পেঁচোর রূপটি,–রূপটি যে কেমন ?” লোকেরা পেঁচোর রূপের কথা বলিল।

শুনিয়া মন্ত্রিপুত্র চলিয়া আসিলেন।

পরদিন মন্ত্রিপুত্র করিলেন কি, পোশাক- টোশাক ছাড়িয়া, গালে মুখে কালি, গায়ে পায়ে ছেঁড়া কানি, বুড়ীর বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত। খক্ খক্ কাশি, খিল্ খিল্ হাসি, দুই হাতে দুই গাছের ডাল- পেঁচোর নাচে উঠান কাঁপে।

আথিবিথি বুড়ী ছুটিয়া আসিল, –“এই তো আমার বাছা!–আহা আহা বুকের মাণিক, কোথায় ছিলি ঘরে এলি?–আয় আয়, তোর জন্যে–

রাজ- রাজিত্বি দুধের বাটী,
রাজকন্যা পরিপাটী
সোনার দানা মোহর থান–
সাতরাজার ধন মণি খান–

–তোরি জন্যে রেখেছি!’’

পেঁচোর–নূপ

আহ্লাদে আটখানা বুড়ী গুড়ুসুড়ু মণিটি বাহির করিয়া চুপি চুপি পেঁচোর হাতে দিল।

মণি পাইয়া পেঁচো তো তিন লাফে, ঘর!- ‘‘মা, মা, আমি তো ভাল হইয়াছি!–এই দেখ কেমন আমার নূপ, –নূপের গাঙ্গে নূপ ভেস্যে যায়।’’

বুড়ী বলিল, –‘‘আহা আহা বাছা আমার ! এত রূপ নিয়ে কোথায় ছিলি,–রাজকন্যা তোর জন্য কাঁদিয়া পাগল!’’

পরদিন বুড়ী আউল চুলের ঝুঁটি বাঁধিয়া, নড়ি ঠকঠক্, রাজার কাছে গেল,–‘‘তা, তা, রাজা মশাই, রাজা মশাই, রাজকন্যা বাহির কর- পেঁচো আমার আসিয়াছে। আহা আহা, পেঁচোর আমার যে রূপ, –রূপ নয় তো নূপ, –নূপের গাঙ্গে নূপ ভেস্যে যায়।’’

রাজা কি করেন, পেঁচোর সঙ্গে রাজকন্যার বিবাহ দিলেন।

(৬)

বাসর ঘরে মন্ত্রিপুত্র পেঁচো রাজকন্যাকে সব কথা বলিলেন। শুনিয়া রাজকন্যা নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিলেন; বলিলেন, –‘‘আমার ভাই মণিমালাকে আটক করিয়া রাখিয়াছেন।’’

তখন মন্ত্রিপুত্র চুপি চুপি বলিলেন, –‘‘আমি যা’ যা’ বলি মণিমালাকে চুপি চুপি এই সব কথা বলিও, আর এই জিনিসটি মণিমালার হাতে দিও।’’ বলিয়া মন্ত্রিপুত্র ফণীর মণিটি রাজকন্যার কাছে দিলেন।

এক দিন, দুই দিন, তিন দিন গেল। চা’র দিনের দিনে, রাত পোহাইলে, মণিমালা বলিলেন, –‘‘রাজপুত্র, আমার ব্রত শেষ হইয়াছে, আমি আজ বরণ- সাজে সাজিয়া নদীর জলে স্নান করিব। আমার সঙ্গে বাদ্য- ভান্ড দিও না, জন- জৌলুষ দিও না; কেবল এক পেঁচো আর রাজকন্যা যাইবেন।’’

অমনি রাজপুরী হইতে নদীর ঘাটে চাঁদোয়া পড়িল। মণিমালা, পেঁচোকে আর রাজকন্যাকে নিয়া বরণ- সাজে স্নান করিতে গেলেন।

স্নান না স্নান!- জলে নামিয়াই মণিমালা বলিলেন, –

‘‘মণি আমার, আমায় ভুলে’ কোথায় ছিলি?’’
‘‘বুড়ীর থলে।’’
‘‘কোথায় এসে আবার মণি আমায় পেলি?’’
‘‘পেঁচোর গলে।’’

মণিমালা বলিলেন, –

‘‘আজ তবে চল্ মণি, অগাধ জলে!’’

দেখিতে- না- দেখিতে নদীর জল দু’ফাঁক হইল, পেঁচো আর রাজকন্যাকে নিয়া মণিমালা তাহার মধ্যে অদেখা হইয়া গেলেন।

রাজপুত্র করেন–“হায়! হায়!”
রাজা রাণী করেন–“হায়! হায়!”
মাথা খুঁড়িয়া বুড়ী মরিল,
রাজ্য ভরিয়া কান্না উঠিল।

(৭)

শিয়রের সাপ গুড়িসুড়ি, গায়ের সাপ ছাড়াছাড়ি, –রাজপুত্র চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া বসিলেন- তখন, মণির আলো মণির বাতি, ঢাক ঢোলে হাজার কাটি, রাজপুত্র মন্ত্রিপুত্র, মণিমালা আর রাজকন্যাকে লইয়া আপন দেশে চলিয়া গেলেন!

পাতালপুরীর সাপের রাজ্যের সকল সাপ বাতাস হইয়া উড়িয়া গেল।

"বাঁচাও বাঁচাও! –বন্ধু জন্মের মতো গেলাম! ! "

সোনার কাটি রূপার কাটি

(১)

এক রাজপুত্র, এক মন্ত্রিপুত্র, এক সওদাগরের পুত্র আর এক কোটালের পুত্র- চার জনে খুব ভাব।

কেহই কিছু করেন না, কেবল ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়ান। দেখিয়া, শুনিয়া রাজা, মন্ত্রী, সওদাগর, কোটাল, বিরক্ত হইয়া উঠিলেন ; বলিয়া দিলেন, – ''ছেলেরা খাইতে আসিলে ভাতের বদলে ছাই দিও।''

মন্ত্রীর স্ত্রী, সওদাগরের স্ত্রী, কোটালের স্ত্রী কি করেন ? চোখের জল চোখে রাখিয়া, ছাই বাড়িয়া দিলেন। ছেলেরা অবাক হইয়া উঠিয়া গেল।

হাজার হ'ক পেটের ছেলে; তা'র সামনে কেমন করিয়া ছাই দিবেন ? রাণী তাহা পারিলেন না। রাণী পরমান্ন সাজাইয়া, থালার এক কোণে একটু ছাইয়ের গুঁড়া রাখিয়া ছেলেকে খাইতে দিলেন।

রাজপুত্র বলিলেন, –"মা, থালে ছাইয়ের গুঁড়া কেন?"

রাণী বলিলেন, –"ও কিছু নয় বাবা, অমনি পড়িয়াছে।"

রাজপুত্রের মন মানিল না; বলিলেন- "না, মা, না বলিলে আমি খাইব না।"

রাণী কি করেন? সকল কথা ছেলেকে খুলিয়া বলিলেন।

শুনিয়া, রাজপুত্র মায়ের পায়ে প্রণাম করিয়া, উঠিলেন।

চার বন্ধুতে রোজ যেখানে আসিয়া মিলেন, সেইখানে আসিয়া সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ কে কেমন খাইয়াছ?"

সকলেই মুখ চাওয়া- চাওয়ি করেন। তখন রাজপুত্র বলিলেন, – "ভাই, আর দেশে থাকিব না, চল দেশ ছাড়িয়া যাই।"

"সেই ভাল।" চারিজনে চারি ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন।

(২)

ঘোড়া ছুটাইতে ছুটাইতে ছুটাইতে ছুটাইতে, চার বন্ধু এক তেপামন্তরের মাঠের সীমায় আসিয়া পৌঁছেছিলেন।

মাঠের উপর দিয়া চার দিকে চার পথ।

কে কোন দিকে যাইবেন? ঠিক হইল, –কোটালের দক্ষিণ, সওদাগরের উত্তর, মন্ত্রীর পশ্চিম আর রাজপুত্রের পূব। তখন সকলে মাথার পাগড়ীর কাপড় ছিঁড়িয়া চার পথের মাঝখানে চার নিশান উড়াইয়া দিলেন, –"যে- ই যখন ফিরুক অন্য বন্ধুদের জন্য এইখানে আসিয়া বসিয়া থাকিবে।"

চার ঘোড়া চার পথে ছুটিল।

সারা দিনমান চার জনে ঘোড়া ছুটাইলেন, কেহই কোথাও গ্রাম, নগর, বন্দর, বাড়ী কিছুই দেখিলেন না; সন্ধ্যার পর আবার সকলেই কোন্ এক এক- ই জায়গায় আসিয়া উপস্থিত!

সে মস্ত এক বন! রাজপুত্র বলিলেন, –"দেখ, আমরা নিশ্চয় রাক্ষসের মায়ায় পড়িয়াছি; সাবধানে রাত জাগিতে হইবে! কিন্তু ক্ষুধায় শরীর অবশ, দেখ কিছু খাবার পাওয়া যায় কি- না।" সকলে ঘোড়া বাঁধিয়া খাবার সন্ধানে গেলেন।

বনে একটিও ফল দেখা যায় না, কোনও জীবজন্তু দেখা যায় না, কেবল পাথর কাঁকর আর বড় বড় বট পাকুড় তাল শিমুলের গাছ!

হঠাৎ দেখেন, একটু দূরে এক হরিণের মাথা পড়িয়া রহিয়াছে। সকলের আনন্দের সীমা রহিল না; কোটালের পুত্র কাঠ কুড়াইতে গেলেন, সওদাগরের পুত্র জল আনিতে গেলেন, মন্ত্রিপুত্র আগুনের চেষ্টায় গেলেন, রাজপুত্র একটা গাছের শিকড়ে মাথা রাখিয়া গা ছড়াইয়া শুইয়া পড়িলেন।

রাজপুত্র ঘুমে। কাঠ নিয়া আসিয়া কোটাল দেখেন, আর বন্ধুরা আসে নাই। কাঠ রাখিয়া কোটাল হরিণের মাথাটি কাটিতে গেলেন।

তরোয়াল ছোঁয়াইয়াছেন–আর অমনি হরিণের মাথার ভিতর হইতে এক বিকটমূর্তি রাক্ষসী বাহির হইয়া কোটাল আর কোটালের ঘোড়াটিকে খাইয়া, আবার যেমন হরিণের মাথা তেমনি হরিণের মাথা হইয়া পড়িয়া রহিল। জল আনিয়া সওদাগর দেখেন, কাঠ রাখিয়া কোটাল- বন্ধু কোথায় গিয়াছে। সওদাগর হরিণের মাথা কাটিতে গেলেন। সওদাগর, সওদাগরের ঘোড়া রাক্ষসীর পেটে গেল।

মন্ত্রী আসিয়া দেখেন, জল আসিয়াছে, কাঠ আসিয়াছে, বন্ধুরা কোথায়? ‘‘আচ্ছা, মাংসটা বানাইয়া রাখি।’’

‘‘বাঁচাও বাঁচাও!- বন্ধু, কোথায় তোমরা-
- জন্মের মত গেলাম!’’

মন্ত্রিপুত্রের চীৎকারে রাজপুত্র ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন। দেখেন, –কি সর্বনাশ, –রাক্ষসী!!! রাক্ষসী মন্ত্রিপুত্র আর মন্ত্রিপুত্রের ঘোড়া খাইয়া রাজপুত্রের ঘোড়াকে ধরিল। তরোয়াল খুলিয়া রাজপুত্র দাঁড়াইলেন; রাজপুত্রের পক্ষীরাজ চেঁচাইয়া বলিল, –‘‘রাজপুত্র, পলাও, পলাও, আর রক্ষা নাই!!’’ রাজপুত্র বলিলেন, –‘‘পলাইব না- বন্ধুদের খাইয়াছে, রাক্ষসী মারিব!’’ রাজপুত্র তরোয়াল উঠাইলেন, –চোখ আঁধার, হাত অবশ। রাক্ষসী আসিয়া রাজপুত্রকে ধরে ধরে, –বনের গাছ পাথর চারিদিক হইতে বলিয়া উঠিল, –‘‘রাজপুত্র, পলাও, পলাও!’’ তখন রাজপুত্র, দিশা হারাইয়া, যে দিকে চক্ষু যায়, দৌড়াইতে লাগিলেন।

রাজপুত্র এক রাজার রাজ্য ছাড়িয়া আর এক রাজার রাজ্যে, –তবু রাক্ষসী পিছন ছাড়ে না। তখন নিরুপায় হইয়া রাজপুত্র সামনে এক আমগাছ দেখিয়া বলিলেন, –"হে আমগাছ! যদি তুমি সত্যকালের বৃক্ষ হও, রাক্ষসীর হাত হইতে আমাকে রক্ষা কর।" আমগাছ দু'ফাঁক হইয়া গেল, রাজপুত্র তাহার মধ্যে গিয়া হাঁফ ছাড়িলেন।

রাক্ষসী গাছকে কত অনুনয় বিনয় করিল, কত ভয় দেখাইল, গাছ কিছুই শুনিল না। তখন রাক্ষসী এক রূপসী মূর্তি ধরিয়া সেই গাছের তলায় বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সেই দেশের রাজা, বনে শিকার করিতে আসিয়াছেন। কান্না শুনিয়া রাজা বলিলেন, –"দেখ তো, বনের মধ্যে কে কাঁদে?" লোকজন আসিয়া দেখে, আমগাছের নীচে এক পরমা সুন্দরী মেয়ে। মেয়েটিকে রাজা রাজপুরীতে নিয়া গেলেন।

"দেখ তো বনের মধ্যে কে কাঁদে?"
এক পরমা সুন্দরী মেয়ে

(৩)

রাজা সেই বনের মেয়েকে বিবাহ করিলেন। রাণী হইয়া রাক্ষসী ভাবিল, –"সেই রাজপুত্রকে কেমন করিয়া খাই!" ভাবিয়া রাক্ষসী, সাত বাসি পামত্মা, চৌদ্দ বাসি তেঁতুলের অম্বল খাইয়া অসুখ বানাইয়া বসিল। তাহার পর রাক্ষসী বিছানার নীচে শোলাকাটি

পাতিল। পাতিয়া সেই বিছানায় শুইয়া রঙ্গীমুখ ভঙ্গী করিয়া চোখের তারা কপালে তুলিয়া, একবার ফিরে এ-পাশ, একবার ফিরে ও-পাশ।

রাজা আসিয়া দেখেন, রাণী খান না, দান না, শুক্ল ঘরে জল ঢালিয়া চাঁচর চুলে আঁচড় কাটিয়া, রাণী শুইয়া আছেন। দেখিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, –"এ কি রাণী! কি হইয়াছে?"

হাড়মুড়মুড় ব্যারাম

কথা কি ফোটে? 'কোঁকাইয়া কোঁকাইয়া' কত কষ্টে রাণী বলিল, –"আমার হাড়মুড়মুড়ীর ব্যারাম হইয়াছে।"

রাণীর গড়াগড়িতে বিছানার নীচের শোলাকাটিগুলা মুড়্ মুড়্ করিয়া ভাঙ্গিতেছিল কি-না? রাজা ভাবিলেন, –"তাই তো? রাণীর গায়ের হাড়গুলা মুড়্ মুড়্ করিতেছি!- হায় কি হইবে!"

কত ওষুধ, কত চিকিৎসা; রাণীর কি যে-সে অসুখ? অসুখ সারিল না! শেষে রাণী বলিল, –"ওষুধে তো কিছু হইবে না, বনের সেই আমগাছ কাটিয়া তাহার তক্তার ধোঁয়া ঘরে দিলে তবে আমার ব্যারাম সারিবে।"

রাজাজ্ঞা, অমনি হাজার হাজার ছুতোর গিয়া আমগাছে কুড়ুল মারিল!

–গাছের ভিতরে রাজপুত্র বলিলেন, –"হে বৃক্ষ, যদি সত্যকালের বৃক্ষ হও, তো আমাকে একটি আমের মধ্যে করিয়া ঐ পুকুরের জলে ফেলিয়া দাও।" অমনি গাছ হইতে একটি আম টুব্ করিয়া পুকুরের জলে পড়িল; তখনি এক রাঘব বোয়াল সেটিকে খাবার মনে করিয়া এক হাঁয়ে গিলিয়া ফেলিল। ছুতোরেরা আমগাছটি কাটিয়া লইয়া গিয়া তাহার তক্তা করিয়া রাণীর ঘরের চারিদিকে খুব করিয়া ধোঁয়া দিতেছে! কিন্তু রাণী সব জানিতে পারিল; বলিল, –"নাঃ, এতেও কিছু হইল না। সে পুকুরে যে রাঘব বোয়াল আছে, তাহার পেটে একটি আম, সেই আমটি খাইলে আমার অসুখ সারিবে।"

সিঙ্গী জাল, ধিঙ্গী জাল, সব জাল নিয়া জেলেরা পুকুরে ফেলিল; রাঘব বোয়াল ধরা পড়িল। পেটের ভিতর আম, আমের ভিতর রাজপুত্র বলিলেন, –"হে বোয়াল, যদি তুমি সত্যিকারের বোয়াল হও, তো আমাকে একটি শামুক করিয়া ফেলিয়া দাও।" বোয়াল রাজপুত্রকে শামুক করিয়া ফেলিয়া দিল। জেলেরা বোয়াল আনিয়া পেট চিরিয়া কিছুই পাইল না।

রাজা ভাবিলেন, –"আর রাণীর অসুখ সারিল না!"

(৪)

এক গৃহস্থের বৌ নাইতে গিয়াছে, রাজপুত্র শামুক তাহার পায়ে ঠেকিল। গৃহস্থের বৌ শামুকটি তুলিয়া আছাড় দিয়া ভাঙ্গিতেই ভিতর

হইতে রাজপুত্র বাহির হইল। গৃহস্থের বৌ ভয়ে জড়সড়। রাজপুত্র বলিলেন, –"বৌ, ভয় করিও না, আমি মানুষ, –রাক্ষসের ভয়ে শামুকের মধ্যে রহিয়াছি। তুমি আমার প্রাণ দিয়াছ, আজ হইতে তুমি আমার হাসন সখী।"

রাজপুত্র হাসন সখীর বাড়ীতে আছেন।

রাণী সব জানিল; রাজাকে বলিল, –"আমার অসুখ তো আর কিছুতেই সারিবে না, আমার বাপের দেশে হাসন চাঁপা নাটন কাটি, চিরণ দাঁতের চিকণ পাটি, আর বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি আছে, সেইগুলি আনাইলে আমার অসুখ সারিবে।"

"কে আনিবে, কে আনিবে?"
"অমুক গৃহস্থের বাড়ী এক রাজপুত্র আছে, সে- ই আনিবে।"
অমনি হাজার হাজার পাইক ছুটিল।

চারিদিকে রাজার পাইক; হাসন সখী ভয়ে অস্থির। রাজপুত্র বলিলেন, –"হাসন সখী, আমারি জন্যে তোমাদের বিপদ, আমি দেশ ছাড়িয়া যাই।"

বাহির হইতেই, পাইকেরা- রাজপুত্রকে ধরিয়া লইয়া গেল! রাজার কাছে যাইতে রাজপুত্র বলিলেন, –"মহারাজ! রাণী আপনার রাক্ষসী; –রাক্ষসীর হাত হইতে আমাকে বাঁচান।"

শুনিয়া রাজা বলিলেন, –"মিথ্যা কথা।–তাহা হইবে না, রাণীর বাপের দেশে হাসন চাঁপা নাটন কাটি, চিরণ দাঁতের চিকণ পাটি, আর

বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি আছে, সেই সব তোমাকে আনিতে হইবে।'' রাজা এক পত্র দিয়া রাজপুত্রকে পাঠাইয়া দিলেন।

(৫)

কি করিবেন, রাজপুত্র চলিতে লাগিলেন। কোথায় সে হাসন চাঁপা নাটন কাটি, কোথায় বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি- কোথায় সে রাণীর বাপের দেশ?–রাজপুত্র ভাবিলেন–‘‘হায়! রাক্ষসীর হাত হইতে কিসে এড়াই!'' রাজপুত্র, যেদিকে চক্ষু যায় চলিতে লাগিলেন।

কত দিন কত রাত চলিতে চলিতে, এক জায়গায় আসিয়া রাজপুত্র দেখেন, এক মস্ত পুরী। রাজপুত্র বলিলেন, –‘‘আহা! এতদিনে আশ্রয় পাইলাম।''

পুরীর মধ্যে গিয়া মানুষ জন কিছু দেখিতে পান না, –খুঁজিতে খুঁজিতে এক ঘরে দেখেন, সোনার খাটে গা রূপোর খাটে পা এক রাজকন্যা শুইয়া আছেন। রাজপুত্র ডাকাডাকি করিলেন, –রাজকন্যা উঠিলেন না! তখন রাজপুত্র দেখেন, বিছানার দুইদিকে দুইটি কাটি– শিয়রের কাটিটি রূপার, পায়ের দিকের কাটিটি সোনার। রাজপুত্র শিয়রের কাটি পায়ের দিকে নিলেন, পায়ের দিকের কাটি শিয়রে নিলেন! রাজকন্যা উঠিয়া বসিলেন।–‘‘কে আপনি!- দেব না দৈত্য, দানব না মানব, –এখানে কেমন করিয়া আসিলেন?–পলাইয়া যান, –পলাইয়া যান, –এ রাক্ষসের পুরী।''

রাজপুত্রের প্রাণ শুকাইয়া গেল।– ‘‘এক রাক্ষসের হাত হইতে আসিলাম, এখানেও রাক্ষস!–রাজকন্যা, আমি কোথায় যাই?''

রাজকন্যা বলিলেন, –‘‘আচ্ছা, আপনি কে আগে বলুন।’’

রাজপুত্র সকল কথা বলিলেন, তারপর বলিলেন–‘‘আমি তো সেই রাক্ষসী রাণীর হাত আজও এড়াইতে পারিলাম না, তা এ রাক্ষসের পুরীতে এমন এক রাজকন্যা কেন?’’

রাজকন্যা বলিলেন, –‘এই পুরী আমার বাপের; রাক্ষসেরা আমার বাপ- মা রাজ- রাজত্ব খাইয়াছে, কেবল আমাকে রাখিয়াছে। যদি আমি পলাইয়া যাই সেই জন্য বাহিরে যাইবার সময় রাক্ষসেরা সোনার কাটি রূপার কাটি দিয়া আমাকে মারিয়া রাখিয়া যায়।’’

শুনিয়া রাজপুত্র ভাবিতে লাগিলেন, কি করিয়া দুইজনে রাক্ষসের হাত হইতে এড়াইবেন।

‘‘আঁই লোঁ মাঁই লোঁ, মাঁনুষের গঁন্ধ পাঁই লোঁ।
ধঁরে ধঁরে খাঁই লোঁ!- ’’

সেই সময় চারিদিক হইতে রাক্ষসেরা শব্দ করিয়া আসিতে লাগিল। রাজকন্যা বলিলেন, –‘‘রাজপুত্র, রাজপুত্র- শীগগির আমাকে মারিয়া ফেলিয়া ঐ যে শিব- মন্দির আছে, ওরি মাঝে ফুল- বেলপাতার নীচে গিয়া লুকাইয়া থাকুন।’’

‘‘আঁই লোঁ মাঁই লোঁ’’ করিয়া রাক্ষসেরা আসিল। বুড়ী রাক্ষসী রাজকন্যাকে বাঁচাইয়া, বলিল; –

"নাতনি লোঁ নাতনি! মাঁনুষ মাঁনুষ গঁন্ধ কঁয়-
মাঁনুষ আঁবার কোঁথায় রঁয়?"

রাজকন্যা বলিলেন, –"মানুষ আবার- থাকিবে কোথায়; আমিই আছি, আমাকে খাইয়া ফেল।"

বুড়ী বলিল, –"উঁ হু হুঁ নাতনি লোঁ, তাঁ' কিঁ পাঁরি!–এঁই নে নাতনি তোঁর জঁন্যে কঁত খাঁবার এঁনেচি।" নাত্নিকে খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া, বুড়ী আর সকল রাক্ষস, নাকে কানে হাঁড়ি হাঁড়ি সরষের তৈল ঢালিয়া নাক ডাকাইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। রাজকন্যা, আয়ীর মাথার পাকা চুল তোলেন আর ডেলা ডেলা এক এক উকুন দুই পাথরের চাপ দিয়া কটাস্ কটাস্ করিয়া মারেন।

রাজকন্যার রাত এই ভাবেই যায়।

পরদিন আবার রাজকন্যাকে মারিয়া রাখিয়া রাক্ষসেরা চলিয়া গেল। রাজপুত্র বাহির হইয়া আসিয়া রাজকন্যাকে জীয়াইলেন, দুইজনে স্নান খাওয়া- দাওয়া করিলেন। রাজপুত্র বলিলেন, –"রাজকন্যা, এ ভাবে কতদনি থাকিব? আজ যখন বুড়ী আসিবে, তখন দুই কথা ছল ভাণ করিয়া, ওদের মরণ কিসে আছে, তাই জিজ্ঞাসা করিও।"

আবার রাক্ষসেরা আসিলে, রাজপুত্র শিবমন্দিরে গিয়া লুকাইলেন। রাজকন্যাকে খাওয়াইয়া- দাওয়াইয়া বুড়ী খাটের উপর বসিল।–রাজকন্যা বলিলেন, –"আয়ি লো আয়ি, কত রাজ্য ঘুরিয়া হাঁপাইয়া হুঁপাইয়া আইলি, আয় একটু বাতাস করি, পাকা চুল দু'গাছ তুলিয়া দি!"

‘ওঁ মাঁ লোঁ মাঁ লঁক্ষ্মি!’’ বুড়ী হাসিয়া চোখ দুইটা কপালে তুলিয়া বলিল, –‘‘হ্যাঁ লোঁ হ্যাঁ নাতনি, পাঁ- টা তোঁ কঁট্ কঁট্ই কঁচ্ছে। এঁকটু টিঁপিয়া দিঁবি?’’

‘‘তা আর দিব না আয়ীমা?’’ হাঁড়ি ভরা সরষের তৈল আয়ীর পায়ের ফাটলে দিয়া, রাজকন্যা আয়ীর পা টিপিতে বসিলেন।

পা টিপিতে বসিয়া রাজকন্যা চোখে তেল দিয়া কাঁদেন, –এক ফোঁটা চোখের জল বুড়ীর পায়ে পড়িল। চমকিয়া উঠিয়া জলফোঁটা আঙ্গুলের আগায় করিয়া নিয়া জিভে দিয়া লোণা লাগিল, বুড়ী বলিল, –‘‘নাতনি

পাঁ–টা কঁটকট্ কঁচ্ছে

তুঁই কাঁদছিঁস্–কেঁন লোঁ, কেঁন লোঁ? তোঁর আঁবার দুঁখু কিঁসের?’’

রাজকন্যা বলিলেন, –‘‘কাঁদি আয়ীমা, কবে বা তুই মরিয়া যাইবি, আর সকল রাক্ষসে আমাকে খাইয়া ফেলিবে।’’

কুলার মত কান নাড়িয়া মূলার মত দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া আয়ী বলিল, –‘‘ওঁরে আঁমার সোঁনার নাঁত্নী, মোঁদের কিঁ মঁরণ আঁছে যেঁ মঁরিব? এ পিঁথিমির মোঁদের কিঁচ্ছুতে মঁরণ নাঁই!- কেঁবল ঐ পুঁকুরে যেঁ ফঁটিকস্তঁম্ভ আঁছে, তাঁর মঁধ্যে এঁক সাঁতফণা সাঁপ আঁছে; এঁক নিঃশ্বাসে উঁঠিয়া ঐ সোঁনার তাঁলগাঁছের তাঁলপত্র খাঁড়া পাঁড়িয়া যঁদি কোঁন রাঁজপুত্র ফঁটিকস্তঁম্ভ

ভাঁঙ্গিয়া সাঁপ বাঁহির কঁরিয়া বুঁকের উঁপর রাঁখিয়া কাঁটিতে পাঁরে, তঁবেই মোঁদের মঁরণ।–তাঁ মাঁটিতে যঁদি এঁক ফোঁটা রঁক্ত পঁড়ে, তোঁ এঁক এঁক ফোঁটায় সাঁত সাঁত হাঁজার কঁরিয়া রাঁক্ষস জঁন্ম নিঁবে!”

শুনিয়া রাজকন্যা বলিলেন, –“তবে আর কী আয়ীমা! তা, কেউ পারিবে না, তোরাও মরিবি না; –আমারও আর ভাবনা নাই। আচ্ছা আয়ীমা! অমুক দেশের রাজার রাণী যে রাক্ষসী তা’র আয়ু কিসে আয়ীমা? আর হাসন চাঁপা নাটন কাটি চিরণ দাঁতের চিকণ পাটি, বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি কোথায় পাওয়া যায় আয়ীমা?”

আয়ী বলিল, “আঁছে লোঁ নাতনি আঁছে! যেঁ ঘঁরে তোঁর বাঁপ থাঁকত সেঁই ঘঁরে আঁছে, আঁর সেঁ ঘঁরে যেঁ এঁক শুঁক, তাঁরি মঁধ্যে আঁমার মেঁয়ে সেঁই রাঁণীর প্রাঁণ! কাঁউকে যেঁন কঁস্ নেঁ নাতনি, সঁব তোঁ আঁমি তোঁকেই দোঁবো।”

পরদিন বুড়ী সকল রাক্ষস নিয়া বাহির হইল; বলিয়া গেল, –“নাতনি লোঁ, আঁজ আঁমরা এই কাঁছেই থাঁকিব।” যে দিন, রাক্ষসেরা দূরের কথা বলে, সে দিন কাছে কাছে থাকে, যে দিন কাছের কথা বলে, সে দিন খুব দূরে দূরে যায়। রাক্ষসেরা চলিয়া গেলে রাজপুত্র আসিয়া রাজকন্যাকে বাঁচাইয়া সকল কথা শুনিলেন। তখনি, স্নান-টান করিয়া, কাপড়চোপড় ছাড়িয়া শিবমন্দিরে ফুল-বেলপাতা অঞ্জলি দিয়া, রাজপুত্র নিশ্বাস বন্ধ করিয়া তালগাছে উঠিয়া তালপত্র খাঁড়া পাড়িলেন। তারপর পুকুরে নামিয়া স্ফটিকস্তম্ভ ভাঙ্গিয়া দেখেন, সাতফণা সাপ। রাজপুত্র সাপ নিয়া উপরে আসিলেন। পৃথিবীর সকল রাক্ষসের মাথা টনটন্ করিয়া উঠল; –যে যেখানে ছিল রাক্ষসেরা

ছুটিয়া আসিতে লাগিল।- আলুথালু চুল, এ- ই লম্বা লম্বা পা ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে বুড়ী সকলের আগে ছুটিয়া আসে–

“আঁই লোঁ মাঁই লোঁ, নাতনি লোঁ নাতনি লোঁ, –
তোঁর মঁনে এঁই ছিঁল লোঁ!
তোঁর মুঁণ্ডুটা চিঁবিয়া খাঁই লোঁ!”

“মুঁণ্ডুটা চিঁবিয়া খাঁই লোঁ”

আর মুণ্ডু খাওয়া! রাজকন্যা বলিলেন, – “রাজপুত্র, শীগগির সাপ কাটিয়া ফেল!”

বুকের উপর রাখিয়া তালপত্র খাঁড়া দিয়া রাজপুত্র সাপের গলা কাটিয়া ফেলিলেন। এক ফোঁটা রক্তও পড়িতে দিলেন না।

সব ফুরাইল, যত রাক্ষস পুকুর পাড়ে আসিতে আসিতেই মুণ্ডু খসিয়া পড়িয়া গেল।

রাজপুত্র রাজকন্যা হাঁপ ছাড়িয়া ঘরে গেলেন। এক কুঠরীতে হাসন চাঁপা নাটন কাটি, চিরণ দাঁতের চিকণ পাটি, সব রহিয়াছে, আর এক শুক পাখী ছটফট্ করিয়া চেঁচাইতেছে। সব লইয়া রাজপুত্র বলিলেন, –“রাজকন্যা, আমার দেশে চল।”

রাজকন্যাকে একখানে রাখিয়া, রাজপুত্র, রাণীর ওষুধ আর শুকটি নিয়া রাজার কাছে গেলেন, –“মহারাজ, আর একবার সভা করিবেন, আমি রাণীর অসুখ সারাইব।”

ভারী খুশী হইয়া রাজা সভা করিয়া বসিলেন। রাজপুত্র কাটি, পাটি, চাঁপা, কাঁকুড় সভায় রাখিলেন। সকলে দেখে, কি আশ্চর্য! রাজপুত্র বলিলেন, –“মহারাজ, রাণীকে নিজে আসিয়া এইগুলি নিতে হইবে।”

রাণীর তো ওদিকে হাড়মুড়মুড়ি গিয়া কলজে- ধড়ফড়ি ব্যারাম হইয়াছে– “ছেলেটা তো তবে সব নাশ করিয়া আসিয়াছে! আজ ওকে খা’ব! রাজ্য খা’ব!!” –

রাজ্য খা!–সভার দুয়ারে রাণী পা দিয়াছে, আর রাজপুত্র বলিলেন, –“ও রাক্ষসী, আমাকে খা’বি?- এই দ্যাখ্!” –রাজপুত্র খাঁচা হইতে শুকটিকে বাহির করিয়া এক টানে শুকের গলা ছিঁড়েন আর কি!- রাক্ষসী বলিল- “খাঁব না, খাঁব না, রাঁখ্ রাঁখ্!! তোঁর পাঁয়ে পঁড়ি!”- রাণীর মূর্তি কোথায়, দাঁত- বিকটী রাক্ষসী!!–

রাজা, সভার সকলে থরথর কাঁপেন।

রাজপুত্র বলিলেন, –“দে, আমার কোটালবন্ধু দে, কোটাল- বন্ধুর ঘোড়া দে! দে, আমার সওদাগরবন্ধু দে, সওদাগরবন্ধুর ঘোড়া দে! মন্ত্রিবন্ধু, মন্ত্রিবন্ধুর ঘোড়া দে, আমার ঘোড়া দে!”

রাক্ষসী হোয়াক্ হোয়াক্ করিয়া একে একে সব উগ্রিয়া দিল! তখন রাজপুত্র বলিলেন, –"মহারাজ, দেখিলেন, রাণী রাক্ষসী কিনা?"–

–"এইবার রাক্ষসী- নিপাত যাও!!"

শুকের গলা ছিঁড়িল- রাক্ষসী গ্যাঁ গ্যাঁ করিয়া পড়িয়া মরিয়া গেল! রাক্ষসীর মরণ, –মরিতে- মরিতেও মরণকাম্ড়ি–রাজার সিংহাসন ধরিয়া টান মারে আর কি!–সার্ সার্ করিয়া রাজা বাঁচিয়া গেলেন।

ঘাম দিয়া সকলের জ্বর ছাড়িল। রাজা বলিলেন, –"ধন্য তুমি কোথাকার রাজপুত্র! যত ধন চাও, ভান্ডার খুলিয়া নিয়া যাও।"

রাজপুত্র বলিলেন, –"আমি কিছুই চাই না, –এতদিনে রাক্ষসীর হাত হইতে সকলে বাঁচিলাম, –এখন আমরা দেশে যাইব।" রাজা শুনিলেন না, ভান্ডার খুলিয়া সকল ধন রত্ন বাহির করিয়া দিলেন।

রাজকন্যাকে লইয়া রাজপুত্র, রাজপুত্রের তিন বন্ধু, দেশে গেলেন। পৃথিবীতে যত রাক্ষস জন্মের মত ধ্বংস হইয়া গেল।

দেশে গিয়া রাজপুত্রেরা, বাপ- মায়ের আদরে, সুখে দিন গণিতে লাগিলেন।

চ্যাং ব্যাং

নূতন বৌ, হাঁড়ি ঢাক, শেয়াল পণ্ডিত ডাকে, –
চিঁ চিঁ চিঁ কিচির মিচির ঝুলির ভিতর থাকে।

পড়ুয়াদের পড়ায় কোথায় কাঁপে শটীর বন,
সাতটি ছেলে কুমীর দিল করে’ সমর্পণ?
তালগাছেতে ড্যাড্যাং ড্যাড্যাং কোথায় হল–বাঃ!

টিকি নাড়ে বুড়ো বামুন, খেতে গেল পিটে,
খ্যাংরা দিয়ে বাম্নী কোথায় মিঠে দিল পিঠে?
রাগে বামুন গেল কোথায়, এলো কবে আর?
কেমন করে’ হল রে বা’র রাজকন্যার হার!

কাঠুরে- বউ ব্রত নিয়ম কেমন শশা খেল?
কোল- জোড়া ধন মাণিক রত্ন কেমন ছেলে পেল?
ব্যাঙ্ ঘ্যাঙ্ঘ্যাঙ্ কামার বুড়ো কাঁপে থর্ থর্–
রাজকন্যা চোখ- বিন্ধুলীর কেমন এল বর!
কোথায় এত থলের ভিতর চিঁচিঁ মিঁচিঁ রব?–
'চ্যাং- ব্যাং'- এর বাসার মাঝে লুকিয়ে ছিল সব!

শিয়াল পণ্ডিতের পাঠশালা

শিয়াল পণ্ডিত

(১)

এক যে ছিল শিয়াল,
    তা'র বাপ দিয়েছিল দেয়াল ;
তা'র ছেলে সে, কম বা কিসে?
    তা'রও হ'ল খেয়াল!

ইয়া- ইয়া গোঁফে চাড়া দিয়া, শিয়াল পণ্ডিত শঁটীর বনে এক মস্ত পাঠশালা খুলিয়া ফেলিল।

চিঁচিঁ পোকা, ঝিঁঝিঁ পোকা, রামফড়িঙ্গের ছা,
কচ্ছপ, কেন্নো হাজার পা,
কেঁচো, বিছে, গুবরে, আরসুলা, ব্যাং,
কাঁকড়া,–মাকড়া–এই এই ঠ্যাং!

শিয়াল পন্ডিতের পাঠশালায় এত এত পড়ুয়া।

পড়ুয়াদের পড়ায়
পণ্ডিতের সাড়ায়,
শঁটীর বনে দিন- রাত হট্টগোল।

দেখিয়া শুনিয়া এক কুমীর ভাবিল, –‘‘তাই তো! সকলের ছেলেই লেখাপড়া শিখিল, আমার ছেলেরা বোকা হইয়া থাকিবে?’’ কুমীর, শিয়াল পন্ডিতের পাঠশালায় সাত ছেলে নিয়া গিয়া হাতে খড়ি দিল।

ছেলেরা আঞ্জি ক খ পড়ে। শিয়াল বলিল, –‘‘কুমীর মশাই, দেখেন কি, –সাতদিন যাইতে- না- যাইতেই আপনার এক এক ছেলে বিদ্যাগজগজ্ ধনুর্ধর হইয়া উঠিবে।’’ মহা খুশী হইয়া কুমীর বাড়ী আসিল।

পণ্ডিত মহাশয় পড়ান, রোজ একটি করিয়া কুমীরের ছানা দিয়া জল খান। এই রকম করিয়া ছয় দিন গেল।

কুমীর ভাবিতেছে, –‘‘কাল তো আমার ছেলেরা বিদ্যাগজ্গজ্ ধনুর্ধর হইয়া আসিবে, আজ একবার দেখিয়া আসি।’’ ভাবিয়া কুমীরানীকে বলিল, –‘‘ওগো, ইলিস- খলিসের চ্চচড়ি, রুই- কাতলার গড়গড়ি, চিতল- বোয়ালের মড়মড়ি সব তৈয়ার করিয়া রাখ, ছেলেরা আসিয়া খাইবে।’’ বলিয়া, কুমীর, পুরানো চটের থান, ছেঁড়া জালের চাদর, জেলে- ডিঙ্গির টোপর পরিয়া এক- গাল শেওলা চিবাইতে চিবাইতে ভুঁড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে

গিয়া উপস্থিত।- ‘‘পণ্ডিত মশাই, পণ্ডিত মশাই, দেখি, দেখি, ছেলেরা আমার কেমন লেখাপড়া শিখিয়াছে।’’

তাড়াতাড়ি উঠিয়া পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, –‘‘আসুন, আনুস, বসনু, বসুন; হ্যাঁরে, গুব্রে তামাক দে, আরে ফরিঙ্গে, নস্যির ডিবে নিয়ে আয়।

জেলে –ডিঙ্গির টোপর

- হ্যাঁরে, কুমীর- সুন্দরেরা কোথায় গেল রে?- বসুন, বসুন, আমি ডাকিয়া নিয়া আসি।’’

গর্তের ভিতরে গিয়া শিয়াল পণ্ডিত সেই শেষ- একটি ছানাকে উঁচু করিয়া সাতবার দেখাইল। বলিল, –‘‘কুমীর মশাই, এত খাটিলাম খুটিলাম, আর একটুর জন্য কেন খুঁত রাখিবেন? সব ছেলেই বিদ্যাগজগজ্ হইয়া গিয়াছে, আর একদিন থাকিলেই একেবারে ধনুর্ধর হইয়া ঘরে যাইতে পারিবে।’’

কুমীর বলিল, –‘‘আচ্ছা, আচ্ছা, বেশ, তাহাই হইবে।’’

বোকা কুমীর খুশী হইয়া চলিয়া গেল।

পরদিন শিয়াল পণ্ডিত বাকী ছানাটিকে দিয়া সব- শেষ- জলযোগ সারিয়া, –পাঠশালা পুঠশালা ভাঙ্গিয়া- পলায়ন!

পিট্টান তো পিট্টান, –কুমীর আসিয়া দেখে, –পড়ুয়ারা পড়ে না, শিয়াল পণ্ডিত ঘরে নাই, –শঁটীর বন খালি। কুমীর তখন সব বুঝিতে পারিল। গালে চড় মাথায় চাপড়, হাপুস নয়নে কাঁদিয়া, কুমীর বলিল, –"আচ্ছা পণ্ডিত দাঁড়া, –

আর কি কাঁকড়া খাবি না?
আর কি খালে যাবি না?
ওই খালে তো কাঁকড়া খাবি, –
দেখি কি করে'
মুই কুমীরের হাত এড়াবি।"

কুমীর চুপ করিয়া খালের জলে লুকাইয়া রহিল।

ক'দিন যায়; শিয়াল পণ্ডিত খালের ঐ ধারে ধারে ঘুরে, প্রাণান্তেও জলটিতে পা ছোঁয়ায় না। শেষে পেটের জ্বালা বড় জ্বালা; –তার উপর, ওপারের চড়ায় কাঁকড়ারা ছায়ে- পোয়ে দলে দলে দাঁড়া বাহির করিয়া ধিড়িং ধিড়িং নাচে; –আর কি সয়? সব ভুলিয়া টুলিয়া, যা'ক প্রাণ থা'ক মান- জলে দিলেন ঝাঁপ!

আর কোথা যায়, – ছত্রিশ গন্ডা দাঁতে কুমীর, পণ্ডিতের ঠ্যাংটি ধরিয়া ফেলিল!

টানাটানি হুড়াহুড়ি, –পণ্ডিত এক নলখাগড়ার বনে গিয়া ঠেকিলেন। অমনি এক নলের আগা ভাঙ্গিয়া হাসিয়া বলিল, –"হাঃ!

কুমীর মশাই এত বোকা তা' তো জানিতাম না!- কোথায় বা আমার ঠ্যাং, কোথায় বা লাঠি! ধরুন ধরুন, লাঠিটা ছাড়িয়া ঠ্যাংটাই ধরিতেন!'' কুমীর ভাবিল, –''অ্যাঁ, –লাঠি ধরিয়াছি?''- ধর্ ধর্!- ঠ্যাং ছাড়িয়া কুমীর লাঠিতে কামড় দিল।

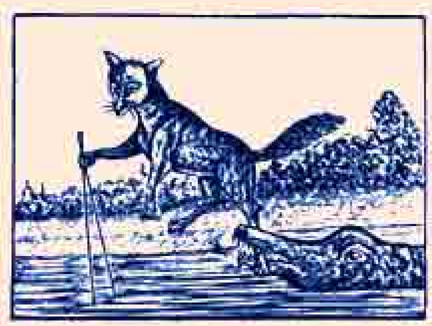

লাঠিটা ছাড়িয়া ঠ্যাংটাই ধরিতেন!

নল ছাড়িয়া দিয়া পণ্ডিত তিন লাফে পার!- ''কুমীর মশাই, হোক্কা হুয়া!- আবার পাঠশালা খুলিব, ছেলে পাঠাইও।''

আবার দিন যায়; শিয়ালের আর লেজটিতেও কুমীর পা দিতে পারে না। শেষে একদিন মনে মনে অনেক যুক্তি বুদ্ধি আঁটিয়া, সটান লেজ, রোদমুখো হাঁ, ঢেঁকি- অবতার হইয়া, কুমীর খালের চড়ায় হাত পা ছড়াইয়া একেবারে মরিয়া পড়িয়া রহিল। শিয়াল পণ্ডিত সেই পথে যায়। দেখিল, –''বস্! কুমীর তো মরিয়াছে! যাই, শিয়ালীকে নিমন্ত্রণটা দিয়া আসি।''

কিন্তু, পন্ডিতের মনে- মনে সন্দ'।- গোঁফে তিন চাড়া দিয়া দাঁত মুখ চাটিয়া চুটিয়া বলিতেছে, –''আহা, বড় সাধুলোক ছিল গো!–কি হয়েছিল গো!- কি করে গেল গো!- আচ্ছা, লোকটা যে মরিল তা'র লক্ষণ কি?'' হুঁ হুঁ–

কান নড়বে পটাপট
লেজ পড়বে চটাচট

হুঁ হুঁ

তবে তো মড়া!- এ বেটা এখনো তবে মরে নি!”

কুমীর ভাবিল, কথা বুঝি সত্যি- কান নাই তবু কুমীর মাথা ঘুরাইয়া কান নাড়ে, চটচটটচট্ লেজ আছাড়ে।

দূরে ছিল কতকগুলি রাখাল–

“ওরে! ওই সে কুমীর ডাঙ্গায় এল,
যে ব্যাটা সে দিন বাছুর খেল!–”

কাস্তে, লাঠি, ইট, পাটকেল ধড়াধ্বড় পড়ে- হৈ হৈ রৈ রৈ করিয়া আসিয়া রাখালের দল কুমীরের পিছনে লাগিয়া গেল।

শিয়াল পণ্ডিত তিন ছুটে চম্পট–

“হোক্কা হোয়া, কুমীর মশাই!
নমস্কার!–এবার পালাই!”

(২)

অনেক দূরে আসিয়া শিয়াল পণ্ডিত এক বেগুনের ক্ষেতে ঢুকিলেন।

ক্ষুধায় পেট্টি আনচান, মনের সুখে বেগুন খান;

খেতে খেতে হঠাৎ কখন্ নাকে ফুটল কাঁটা,
“হ্যাঁচ্–হ্যাঁচ–হ্যাঁচ্–ফ্যাঁচ্–ফ্যাঁচ্–ফ্যাঁচ্–”
কিছুতেই কিছু না, রক্তে ভেসে গেল গা- টা

শেষে, কাবুজাবু হইয়া শিয়াল নাপিতের বাড়ী গেলেন–

“নরসুন্দর নরের সুন্দর ঘরে আছে হে?
বাইরে একটু এস রে ভাই নুরুণখানা নে।”

নাপিত বড় ভাল মানুষ ছিল; নরুণ লইয়া আসিয়া বলিল, –“কে ভাই, শিয়াল পণ্ডিত?–তাই তো, এ কি! আহা- হা নাকটা তো গিয়াছে!” দু ফোঁটা চোখের জল ফেলিয়া ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া শিয়াল বলিল, –

“ওই তো দুঃখে কাঁদি রে ভাই, মন কি আমার আছে?
তুমি ছাড়া আর গতি নাই, –এলাম তোমার কাছে।”

নাপিত বড় দয়াল, মন গলিল; বলিল, –“বস, বস, কাঁটা খুলিয়া দিতেছি।”

একে হ’ল আর,
শিয়ালের নাক কেটে গেল, কাঁটা কর্তে বার!

একে হ'ল আর

"উঁয়া, উঁয়া! হুঁয়া, হুঁয়া!–ক্ক্যাঃ–ক্ক্যাঃ!!!–ওরে হতভাগা পাজী পাষণ্ডে' নাপ্তে!- দ্যাখতো–দ্যাখতো কি করেছিস্!–দে ব্যাটা আগে আমার নাক জুড়িয়া দে, –নইলে তোকে দেখাচ্ছি!"

ভাল মানুষ নাপিত ভয়ে থতমত, বলিল, –"দাদা! বড় চুক হইয়া গিয়াছে; মাফ্ কর ভাই, নইলে গরীব প্রাণে মারা যাই।"

তবে একটি হাঁড়ি দাও

শিয়াল বলিল, – "আচ্ছা যা'; যা হইবার তা' তো হইল; –তবে তোর নরুণখানা আমাকে দে, তোকে ছাড়িয়া দিতেছি।"

কি করে?- নাপিত শেয়ালকে নরুণখানা দিল। নরুণ পাইয়া শিয়াল বলিল, –"আচ্ছা, তবে আসি।"

শিয়াল এক কুমোরের বাড়ীর সামনে দিয়া যায়; দেখিয়া কুমোর বলিল, –"কে হে বট ভাই, কে যাচ্ছ?- মুখে ওটা কি?"

শিয়াল বলিল,–"কুমোর ভাই না-কি? ও একটা নরুণ নিয়া যাচ্ছি।"

কুমোরেরও একটা নরুণের বড় দরকার–বলিল, ‘‘তা, ভাই, দেখি দেখি, তোমার নরুণটা কেমন?’’

পরখ করিতে করিতে নরুণটা মট করিয়া ভাঙ্গিয়া গেল; কুমোর বলিল; –‘‘আঃ–হাঃ!’’

চটিয়া উঠিয়া শিয়াল বলিল, – ‘‘আজ্ঞে কুমোরের পো, সেটি হবে না! ভাল চাও তো আমার নরুণটি যোগাইয়া দাও!’’

সে গাঁয়ে কামার নাই। নিরুপায় হইয়া কুমোর বলিল, – ‘‘এখন কি করি ভাই, মাফ্ না করিলে যে গরীব মারা যায়!’’

শিয়াল বলিল, ‘‘তবে একটি হাঁড়ি দাও!’’

কুমোর একটি হাঁড়ি দিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। হাঁড়ি লইয়া শিয়াল, আবার চলিতে লাগিল।

এক বিয়ের বর যায়! বোম পটকা, আতসবাজি ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে সকলে চলিয়াছে। অন্ধকারে, কে জানে ?- একটা পটকা ছুটিয়া গিয়া শিয়ালের হাঁড়িতে পড়িল। হাঁড়িটি ফাটিয়া গেল। দুই চোখ ঘুরাইয়া আসিয়া শিয়াল বলিল, –‘‘কে হে বাপু বড় তুমি বর যাচ্ছ- বাজি পোড়াবার আর জায়গা পাও নাই? ভাল চাও আমার হাঁড়িটি দাও!’’

বর ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গেল। সকলে বলিল, –‘‘মাফ্ কর ভাই, মাফ্ কর ভাই, নইলে আমরা সব মারা যাই।’’

শিয়াল বলিল, –‘‘সেটি হবে না- কনেটিকে আমাকে দাও, তারপর তোমরা যেখানে খুশী যাও।’’

কি আর করে?- বর, কনেটি শিয়ালকে দিল।

কনে পাইয়া শিয়াল সেখান হইতে চলিল।

এক ঢুলীর বাড়ী গিয়া শিয়াল বলিল- ‘‘ঢুলী ভাই, ঢুলী ভাই, তোমরা ক’জন আছ?- অআমি বিয়ে করিব, সব ঢোল বায়না কর দেখি। কনেটি তোমার এখানে থাকিল, আমি পুরুতবাড়ী চলিলাম।’’

ঢুলী ঢোল বায়না করিতে গেল, শেয়াল পুরুতবাড়ী চলিল। ঢুলীবউ কুটনা কাটিতে বসিয়াছে। কনেটি ঝিমাইতে ঝিমাইতে বঁটির উপরে পড়িয়া গিয়া কাটিয়া দুইখানা হইয়া গেল। ভয়ে ঢুলীবউ কনের দুই টুকরা নিয়া খড়ের গাদায় লুকাইয়া রাখিয়া আসিল।

পুরুত নিয়া আসিয়া শিয়াল দেখে, কনে নাই! - ‘‘ভাল চাও তো ঢুলীবউ কনেটি এনে দাও!’’ ভয়ে ঢুলীবউ ঘরে উঠিয়া বলে, –‘‘ও মা, কি হবে গো!’’

শিয়াল বলিল, –‘‘সে সব কথা থাক্, ঢুলীর ঢোলটি দাও তো ছাড়িয়া দিচ্ছি!’’

ঢুলীবউ ভাবিল, –বাঁচিলাম!- তাড়াতাড়ি ঢোলটি আনিয়া দিয়া ঘরে গিয়া দুয়ার দিল।

ঢোল নিয়া গিয়া শিয়াল এক তালগাছের উপর উঠিয়া বাজায় আর গায়, –

“তাক্ ডুমা ডুম্ ডুম্!!!
বেগুন ক্ষেতে ফুটল কাঁটা- তাক ডুমা ডুম্ ডুম্!
কাঁটা খুলতে কাটল নাক,
তাক ডুমা ডুম্ ডুম্!
নাকুর বদল নরুণ পেলাম,
তাক্ ডুমা ডুম্ ডুম্!
নরুণ দিয়ে হাঁড়ি পেলাম- তাক্ ডুমা ডুম্ ডুম্!
হাঁড়ির বদল কনে পেলাম- তাক্ ডুমা ডুম্ ডুম্!
কনি গিয়ে ঢোল পেয়েছি- তাক্ ডুমা ডুম্ ডুম!
ডাগুম ডাগুম ডুগ্ ডুমা ডুম্!!
ডুম্ ডুমা ডুম্ ডুম্!!”

মনের আনন্দে শিয়াল যেই নাচিয়া উঠিয়াছে, অমনি পা হড়কাইয়া গিয়া–

বাঃ!!!

সুখু আর দুখু

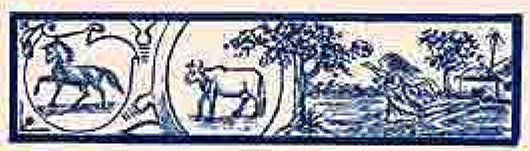

(১)

এক তাঁতী, তা'র দুই স্ত্রী। দুই তাঁতীবউর দুই মেয়ে, –সুখু আর দুখু। তাঁতী, বড় স্ত্রী আর বড় মেয়ে সুখুকে বেশি বেশি আদর করে। বড় স্ত্রী বড় মেয়ে ঘর- সংসারের কূটাটুকু ছিঁড়িয়া দুইখানা করে না; কেবল বসিয়া বসিয়া খায়। দুখু আর তা'র মা সূতা কাটে, ঘর নিকোয়; দিনান্তে চারটি চারটি ভাত পায়, আর, সকলের গঞ্জনা সয়।

একদিন তাঁতী মরিয়া গেল। অমনি বড় তাঁতীবউ তাঁতীর কড়িপাতি যা' ছিল সব লুকাইয়া ফেলিল, আপন মেয়ে নিয়া, দুখু আর দুখুর মাকে ভিন্ন করিয়া দিল।

সুখুর মা আজ হাটের বড়মাছের মুড়াটা আনে, কাল হাটের বড় লাউটা আনে, রাঁধে, বাড়ে, সতীন সতীনের মেয়েকে দেখাইয়া দেখাইয়া খায়।

দুখুর মা আর দুখুর দিনে রাত্রে সূতা কাটিয়া কোনদিন একখানা গামছা, কোন দিন একখানা ঠেঁটী, এই হয়। তাই বেচিয়া একবুড়ি পায়, দেড়বুড়ি পায়, তাই দিয়া মায়ে ঝিয়ে চারিটি অন্ন পেটে দেয়।

একদিন সূতা নাতা ইঁদুরে কাটে, তূলাটুকু নেতিয়ে যায়, – দুখুর মা, সূতা গোছা এলাইয়া দিয়া, তূলা ডালা রোদে দিয়া, ক্ষারকাপড়খানা নিয়া ঘাটে গিয়াছে। দুখু তূলা আগ্লাইয়া বসিয়া আছে। এমন সময় এক দমকা বাতাস আসিয়া দুখুর তূলাগুলা উড়াইয়া নিয়া গেল! একটু তূলাও দুখু ফিরাইতে পারিল না; শেষে দুখু কাঁদিয়া ফেলিল!

তখন বাতাস বলিল, –“দুখু, কাঁদিস নে, আমার সঙ্গে আয়, তোকে তূলা দেব।” দুখু কাঁদিতে কাঁদিতে বাতাসের পিছু- পিছু গেল।

যাইতে যাইতে পথে এক গাই দুখুকে ডাকে, –“দুখু, কোথা যাচ্ছ- আমার গোয়ালটা কাড়িয়া দিয়া যাবে?” দুখু চোখের জল মুছিয়া, গাইয়রে গোয়াল কাড়িল, খড় জল দিল; দিয়া আবার বাতাসের পিছু চলিল।

খানিক দূর যাইতেই এক কলাগাছ বলিল, –“দুখু, কোথা যাচ্ছ– আমায় বড় লতাপাতায় ঘিরিয়া আছে, এগুলিকে টেনে দিয়ে যাবে?” দুখু একটু থামিয়া কলাগাছের লতাপাতা ছিঁড়িয়া দিল।

আবার খানিক দূর যাইতে, এক সেওড়া গাছ ডাকিল, –“দুখু, কোথা যাচ্ছ- আমার গুঁড়িটায় বড় জঞ্জাল, ঝাড় দিয়া যাবে?” দুখু

সেওড়ার গুঁড়ি ঝাড় দিল, তলার পাতাকূটা কুড়াইয়া ফেলিল। সব ফিটফাট্ করিয়া দিয়া, আবার দুখু বাতাসের সঙ্গে চলিল।

একটু দূরেই এক ঘোড়া বলিল- “দুখু, দুখু, কোথা যাচ্ছ, – আমাকে চার গোছা ঘাস দিয়া যাবে?” দুখু ঘোড়ার ঘাস দিল। তারপর চলিতে চলিতে দুখু বাতাসের সঙ্গে কোথায় দিয়া কোথায় দিয়া এক ধবধবে বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত!

বাড়ীতে আর কেউ নাই; ফিটফাট ঘরদোর, ঝকঝক আঙিনা, কেবল দাওয়ার উপরে এক বুড়ী বসিয়া সূতা কাটিতেছে, সেই সূতায় চক্ষের পলকে পলকে জোড়ায় জোড়ায় শাড়ী হইতেছে।

বুড়ী আর কেউ না, চাঁদের মা বুড়ী! বাতাস বলিল, –“দুখু, বুড়ীর কাছে গিয়া তূলা চাও, পাবে।” দুখু গিয়া বুড়ীর পায়ে ঢিপ করিয়া প্রণাম করিল, বলিল, –“দ্যাখ তো আয়ীমা, বাতাস আমার সবগুলো তূলা নিয়া আসিয়াছে- মা আমায় বক্বে আয়ীমা, আমার তূলো গুনো নিয়ে দাও।”

চুলগুলো যেন দুধের ফেনা, চাঁদের আলো; সেই চুল সরাইয়া চোখ তুলিয়া চাঁদের মা বুড়ী দেখে ছোট্ট খাট্ট মেয়েটি- চিনি হেন মিষ্টি- মধুর বুলি। বুড়ী বলিল, – “আহা সোনার চাঁদ বেঁচে থাক। ওঘরে গামছা আছে, ওঘরে কাপড় আছে, ওঘরে তেল আছে, ঐ পুকুরে গিয়া দুটো ডুব দিয়া এসো; এসে ওঘরে গিয়া আগে চাট্টি খাও, তারপরে তূলো দেবো এখন।”

ঘরে গিয়া দুখু, –কত কত ভাল ভাল গামছা, কাপড় দেখে, - তা সব ঠেলিয়া, যা’ তা’ ছেঁড়া নাতা গামছা কাপড় নিয়া, যেমন- তেমন একটু তেল মাথায় ছোঁয়াইয়া, এক চিমটি ক্ষার খৈল নিয়া নাইতে গেল।

ক্ষার খৈল টুকু মাখিয়া জলে নামিয়া দুখু ডুব দিল। ডুব দিতেই এক ডুবে দুখুর সৌন্দর্য উথলে পড়ে!- সে কি রূপ!- অত রূপ দেবকন্যারও নাই!- দুখু তা’ জানিতেও পারিল না। আর একডুবে দুখুর গয়না, –গায়ে ধরে না, পায়ে ধরে না। সোনাঢাকা অঙ্গ নিয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া আসিয়া দুখু খাবার ঘরে গেল।

খাবার ঘরে কত জিনিস, দুখু কি জানে? জন্মেও অত সব দেখে নাই! এক কোণে বসিয়া দুখু চারটি পান্তা খাইয়া আসিল। চাঁদের মা বুড়ী বলিল, –‘‘আমার সোনার বাছা এসেছিস!- ঐ ঘরে যা, পেঁটরায় তূলা আছে, নাও গে!’’

দুখু গিয়া দেখিল, –পেঁটরার উপর পেঁটরা- ছোট, বড়, ক- ত রকমের! দুখু এক পাশের ছোট্ট এতটুকু এক খেলনা- পেঁটরা নিয়া বুড়ীর কাছে দিল। বুড়ী বলিল, –‘‘আমার মানিক ধন! আমার কাছে কেন, এখন মা’র কাছে যাও, এই পেঁটরায় তূলা দিয়াছি।’’ বুড়ীর পায়ের ধূলা নিয়া পেঁটরা কাঁখে, রূপে, গয়নায়, পথ ঘাট আলো করিয়া দুখু বাড়ী চলিল।

পথে ঘোড়া বলিল, –‘‘দুখু দুখু, এস এস, আর কি দিব, এই নাও।’’ ঘোড়া খুব তেজী এক পক্ষী রাজ বাচ্চা দিল।

সেওড়া গাছ বলিল, –“দুখু, দুখু, এস এস, আর কি দিব, এই নাও।” সেওড়া গাছ এক ঘড়া মোহর দিল।

কলাগাছ বলিল, –“দুখু, দুখু, এস এস, আর কি দিব, এই নাও।” কলাগাছ মস্ত এক ছড়া সোনার কলা দিল।

গাই বলিল, –“দুখু, দুখু, এস এস, আর কি দিব, এই নাও।” গাই এক কপিলা- লক্ষণ বক্না দিল। ঘোড়ার বাচ্চার পিঠে ঘড়া, ছড়া তুলিয়া, বক্না নিয়া দুখু বাড়ী আসিল।

দুখু

“দুখু, দুখু, ও পোড়ারমুখী- তূলা নিয়া কোথায় গেলি?–” ডাকিয়া, ডুকিয়া, আনাচ কানাচ, খানা জঙ্গল খুঁজিয়া, মেয়ে না পাইয়া দুখুর মা অস্থির–দুখুর মা ছুটিয়া আসিল, “ও মা, মা আমার, এতক্ষণ তুই কোথায় ছিলি?” –আসিয়া দেখে,– “ও মা! এ কি অন্ধের নড়ি দুঃখিনীর মেয়ে এ সব তুই কোথায় পেলি!” – মা গিয়া দুখুকে বুকে নিল।

মাকে দুখু সব কথা বলিল; শুনিয়া দুখুর মা মনের আনন্দে দুখুকে নিয়া সুখুর মা’র কাছে গেল, –“দিদি, –ও সুখু, সুখু, আমাদের দুঃখ ঘুচেছে, চাঁদের মা বুড়ী দুখুকে এই সব দিয়াছে। সুখু কতক নাও, দুখুর কতক থাক।”

চোখ টানিয়া মুখ বাঁকাইয়া- তিন ঝাক্কা ভিরকুট্টি, সুখুর মা বলিল, –‘‘বালাই! পরের কড়ির ভাগ- বাঁটরি- তার কপালে খ্যাংরা মারি! তেমন পোদ্দারী সুখুর মা করে না! ছাই- নাতা আগর- বাগর তোরাই নিয়া ধুইয়া, খা।’’ মনে মনে সুখুর মা বিড়্ বিড়্- ‘‘শত্তুরের কপালে আগুন, –কেন, আমার সুখু কি জলে ভাসা মেয়ে? দরদ দেখে মরে যাই! কপালে থাকে তো, সুখু আমার কালই আপনি ইন্দ্রের ঐশ্বর্য লুটে আনবে।’’ মুখ খাইয়া দুখু দুখুর মা ফিরিয়া আসিল।

রাত্রে পেঁটরা খুলিতেই দুখুর রাজপুত্র- বর বাহির হইল। রাজপুত্র- বর ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়ায়, কপিলার দুধে আঁচায়, –দুখু, দুখুর মা’র ঘর- কুঁড়ে আলো হইয়া গেল।

(২)

রা নাই, শব্দ নাই, সুখুর মা সামনের দুয়ারে খিল দিয়াছে। পরদিন সুখুর মা পিছন দুয়ারে তুলা রোদে দিয়া ‘পিস্পিস্’ ‘ফিস্ফিস্’ সুখুকে বসাইয়া ক্ষার কাপড়ে পুঁটলি বাঁধিয়া ঘাটে গেল।

কতক্ষণ পর বাতাস আসিয়া সুখুর তূলা উড়াইয়া নেয়, –কুটিকুটি সুখু, –বাতাসের পিছু পিছু ছুটিল!

সেই গাই ডাকিল, –‘‘সুখু, কোথা যাচ্ছ শুনে যাও।’’ সুখু ফিরিয়াও দেখিল না। কলাগাছ, সেওড়া গাছ, ঘোড়া সকলেই ডাকিল, দুখু কাহারও কথা কানে তুলিল না। সুখু আরো রাগিয়া গিয়া

গালি পাড়ে, –“উঁ! আমি যাবো চাঁদের মা বুড়ীর বাড়ী, তোমাদের কথা শুনতে বসি!”

বাতাসের সাথে সাথে সুখু চাঁদের মা বুড়ীর বাড়ী গেল। গিয়াই, – “ও বুড়ি, বুড়ি, বসে’ বসে’ কি কচ্ছিস? আমায় আগে সব জিনিস দিয়ে নে, তার পর সূতো কাটিস। হুঁ! উনুনমুখী দুখু, তা’কেই আবার এত সব দিয়েছেন!” বলিয়া, সুখু, বুড়ীর চরকা মরকা টানিয়া ভাঙ্গে আর কি!

চাঁদের মা বুড়ী অবাক।- “রাখ্ রাখ্”- ওমা! এতটুকু মেয়ে তার কাঠ কাঠ কথা, উড়ুনচন্ডে’ কান্ড! বুড়ী চুপ করিয়া রহিল; তারপর বলিল, –“আচ্ছা, নেয়ে খেয়ে নে, তারপর সব পাবি।”

বলতে সয় না, সুখু দুড়দাড় করিয়া এ ঘর থেকে’ সব্বার ভাল গামছা খানা, ওঘর থেকে, সব্বার ভাল শাড়ী খানা, সুবাস তেলের হাঁড়ি চন্দনের বাটি যত কিছু নিয়া ঘাটে গেল।

সাতবার করিয়া তেল মাখে, সাতবার করিয়া মাথা ঘষে, ফিরিয়া ফিরিয়া চায়, –সাতবার করিয়া আর্শি ধরিয়া মুখ দেখে, –তবু সুখুর মনের মত হয় না। তিন প্রহর ধরিয়া এই রকম করিয়া শেষে সুখু জলে নামিল।

এক ডুবে সৌন্দর্য! এক ডুবে গহনা!!- আঃ!!!- আর সুখুকে পায় কে? সুখু এদিকে চায়, সুখু ওদিকে চায়, “যত যত ডুব দিব, না জানি আরো কি পাব!”

"আঁই- আঁই- আঁই!!!" – তিন ডুব দিয়া উঠিয়া সুখু দেখে, – গা-ভরা আঁচিল, ঘা পাঁচড়া- এ- ই নখ, শোণের গোছা চুল- কত কদর্য সুখুর কপালে!– "ওঁ মাঁ গোঁ!–কিঁ হঁল গোঁ" – কাঁদিতে কাঁদিতে সুখু বুড়ীর কাছে গেল।

দেখিয়া বুড়ী বলিল, –"আহা আহা ছাইকপালি, –তিন ডুব দিয়াছিলি বুঝি?- যা, কাঁদিসনে যা; –বেলা ব'য়ে গেছে, খেয়ে, দেয়ে নে!" বুড়ীকে গালি পাড়িতে পাড়িতে সুখু, খাবার ঘরে গিয়া পায়েস পিঠা ভাল ভাল সব খাবার খাবলে খাবলে খাইয়া ছড়াইয়া হাত মুখ ধুইয়া আসিল- "আচ্ছা বুড়ি, মাঁর কাঁছে আঁগে যাঁই!- দেঁ তুঁই পেঁটরা দিঁবি কিঁ না দেঁ।"

বুড়ী পেঁটরার ঘর দেখাইয়া দিল। য- ত বড় পারিল, এ- ই মস্ত এক পেঁটরা মাথায় করিয়া সুখু বিড়্ বিড়্ করিয়া বুড়ীর চৌদ্দ বুড়ীর মুন্ডু খাইতে খাইতে রূপে দিক্ চমকাইয়া বাড়ী চলিল!

সুখুর রূপ

সুখুর রূপ দেখিয়া শিয়াল পালায়, পথের মানুষ মূর্ছা যায়।

পথে ঘোড়া এক লাথি মারিল; সুখু করে- "আঁই আঁই!" সেওড়া গাছের এক ডাল মটাস করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল, সুখু করে- "মঁলাম! মঁলাম!" কলাগাছের এক কাঁদি কলা ছিঁড়িয়া পিঠে পড়িল; সুখু বলে- "গেঁলাম! গেঁলাম!" শিং বাঁকা করিয়া, গাই তাড়া করিল, ছুটিতে

ছুটিতে হাঁপাইয়া আসিয়া সুখু বাড়ীতে উঠিল।

দুয়ারে আলপনা দিয়া, ঘট পল্লব নিয়া জোড়া পিঁড়ি সাজাইয়া সুখুর মা বসিয়া ছিল। বারে বারে পথ চায়-

সুখুকে দেখিয়া, সুখুর মা
“ও মা! মা! ও মা গো, কি হবে গো!
কোথায় যাব গো!”

চোখের তারা কপালে, আছাড় খাইয়া পড়িয়া সুখুর মা মূর্ছা গেল!
উঠিয়া সুখুর মা বলে, –“হ’ক হ’ক অভাগী, পেঁটরা নিয়ে ঘরে তোল্; দ্যাখ আগে, বর এলে বা সব ভাল হইবে!”

দুইজনে পেঁটরা নিয়া ঘরে তুলিল।
রাত্রে পেঁটরা খুলিয়া, সুখুর বর বাহির হইল!- সুখু বলে, –“মা, পা কেন কন্ কন্?”

মা বলিল, –“মল পর।”
সুখু- “মা, গা কেন ছন্ ছন্?”
মা- “মা, গয়না পর।”

তারপর সুখুর হাত কট কট, গলা ঘড় ঘড়, মাথা কচ কচ ক- ত করিল, –সুখু হার পরিল, নথ নোলক, সিঁথি পরিয়া টরিয়া সুখু চুপ করিল। মনের আনন্দে, সুখুর মা ঘুমাইতে গেল।

পরদিন সুখু আর দোর খোলে না, –"কেন লো, –কত বেলা, উঠবি না ?"

নাঃ, নাওয়ার খাওয়ার বেলা হইল, সুখু উঠে না। সুখুর মা গিয়া কবাট খুলিল।– "ও মা রে মা!" –সুখু নাই, সুখুর চিহ্ন নাই–ঘরের মেজেতে হাড় গোড়, অজগরের খোলস!– অজগরে সুখুকে খাইয়া গিয়াছে!!–

চেলাকাঠ মাথায় মারিয়া সুখুর মা মরিয়া গেল।

ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী

হলেন বনগামী

(১)

এক যে ছিল ব্রাহ্মণী, আর তার যে ছিল পতি, –ব্রাহ্মণীটি বুদ্ধির ঘড়া, ব্রাহ্মণ বোকা অতি! কাজেই সংসারের যত কাজ ব্রাহ্মণীরই হ'ত করতে, ব্রাহ্মণ শুধু খেতেন বসে, ব্রাহ্মণীর হ'ত মরতে। ব্রাহ্মণীটি যে, –রণচন্ডী!– নথের ঝাঁকিতে নাক ছিঁড়ে।–মাথার চুলে তৈল নাই, গা- গতরে খৈল নাই, 'নিত্য ভিক্ষা তনু রক্ষা', তার উপর আবার বামুনের চাটাল চাটাল কথা। জ্বালাতন- পালাতন বামনী ধান ঝাড়ে, তা'র তুষ ফেলে, কি, ধান ফেলে!

এমন সময় ব্রাহ্মণ গিয়া বলিল– 'বামনী, আজ বুঝি পিটে করবি, না?'

কূলো মূলো ফেলিয়া খ্যাংরা নিয়া ব্রাহ্মণী গর্জে উঠিল, 'হ্যাঁ, পিটে করতেই বসেছি! চাল বাড়ন্ত হাঁড়ি খট খট- এক কড়ার মুরোদ নাই পিটা- খেকোর পুত পিটা খাবে!–বেরো আমার বাড়ী থেকে!'

গর্জনে উঠান কাঁপে, গাছ থর থর পক্ষী উড়ে; –ব্রাহ্মণ ভাবলেন-

"কি? ব্রাহ্মণী, তার গালি সইব এত আমি?
তা' হবে না!"
তখনি রাগে হলেন বনগামী!

(২)

বনে বনে ঘোরেন, এমন সময় এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে ব্রাহ্মণের দেখা। সকল কথা শুনিয়া, সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণকে আপন আশ্রমে নিয়া গেলেন।

আশ্রমে গিয়া ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীর কাছে লেখাপড়া শিখেন।

কান নড়বড় বুড়ো বামুন
মুনির কাছে পড়েন কেমন?

এ বেলা পড়েন, –"ক–চ–প–অ- অ- অ"
ও বেলা পড়েন, –"খ–চ–ক–অ- অ- অ!"
দিনে পড়েন, –"হগড়ং ডগড়ং বগ বগ বগড়ম।"

রাতে পড়েন, –‘‘চং, ছং, কঁরঁরঁঅম্- ঘড়্- ড়্ ঘড়ম্!’’ নাকের ডাকে গলার ডাকে নিশি ভোর!

এই রকম করিয়া ব্রাহ্মণ খুব অনেক বিদ্যা শিখিয়া ফেলিলেন।
শিখিয়া শুখিয়া ব্রাহ্মণ

মনে মনে, ভাবলেন- আমি হনু একজন!
বিদ্যেয় এখন ছড়াছড়ি যাবে যশ ধন!
তখন- বামনীর সে বিষমুখ দেখতে না আর হবে, –

হাঃ! হাঃ!
তখন আমি কোথায় রব, আর বামনী কোথা রবে!

ভারি স্ফূর্তি।- কিসের আবার সন্ন্যাসীর কাছে বলা টলা!-

খুঙ্গি পুঁথি লাঠি চাটি বাঁধিয়া পুঁটুলী
“জয় জগদম্বা!” বামুন, দেশে গেলেন চলি।

(৩)

ভাদ্দুরে’ রোদ, তাল পাকে, মাটি পাথর ফাটে, –সন্ধ্যাবেলায় ব্রাহ্মণ আপন গাঁয়ের সীমায় আসিলেন।– ‘ঠিক তো!- রাজার বাড়ী তো যাবই তো, তা মরিল কি রইল, বামনীটাকে একবার দেখে’- গেলেও- হয়।’ একটু রাত হইয়াছে, তখন ব্রাহ্মণ, বাড়ীর আঙ্গিনায় উঠিয়াছেন।

ছ্যাঁক্ ছ্যাঁক্ শব্দ বামুন, শুনতে পেলেন, কানে, –

"বামনী ভাজেন তালের বড়া, বুঝি অনুমানে!"

ব্রাহ্মণ চু- প্‌ করিয়া কানাচে কান পাতিয়া রহিলেন।

'কটা হল ছ্যাঁক?- মনে মনে ল্যাখ্‌।
চার, পাঁচ, সাত, আট- এক কুড়ি এক।'

তখন আর 'ছ্যাঁক' নাই; –ব্রাহ্মণী হাত পা ধুইয়া যেই বাহিরে আসিলেন,

ব্রাহ্মণ ডাকিলা উচ্চে–"ব্রাহ্মণী আছ বাড়ী?
এবার আমি শিখে এলাম বিদ্যে ভারি ভারি!"

চমকিয়া ব্রাহ্মণী ছুটিয়া আসিয়া দেখেন- সারা- অঙ্গে তিলক ফোঁটা ব্রাহ্মণ আসিয়া হাজির! ব্যস্তে স্বস্তে ব্রাহ্মণী বলিলেন, –'এতদিন কোথায় ছিলে?'

ব্রাহ্মণ বলিলেন, –'ব্রাহ্মণী! আমি খুব ভারি ভারি বিদ্যা শিখিয়া আসিয়াছি, তাই তোকে বলিয়া যাইতে আসিয়াছি!'

ব্রাহ্মণী বলিলেন, –'দূর পাগল!'
ব্রাহ্মণ বলিলেন, –

'জানিসনে তাই বলছিস্‌ অমন, নইলে এতক্ষণ
এককুড়ি এক বড়া সাজিয়ে দিতিস নেমন্তন।'

'অ্যাঁ? তুমি কি করে জানিলে?'

ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'বামনি!–

ঐ তো বিদ্যের মা জননী! বল্লেম আমি গণে'; –

যেখানে যে ভাজুক বড়া সবি আমার মনে!'

শুনিয়া ব্রাহ্মণী অবাক!- 'আহা, আহা, সত্যি কি, সত্যি কি?' ব্রাহ্মণী মনের আনন্দে–

ছুটে গিয়ে যত পাড়ার লোকের কাছে কয়, –
"বামুন এল বিদ্যে শিখে, যেমন বিদ্যে নয়।"

পাড়ার লোকে আশ্চর্য!- আসিয়া দেখে, –

মেলাই পুঁথি খুলে' বামুন ঘন টিকি নাড়ে
হং লং বং চং লম্বা বচন ঝাড়ে–

সে সব কি যে- সে বোঝে? সকলের চমক লাগিয়া গেল।

দেখতে দেখতে সারা গাঁয়ে রাষ্ট্র হল যে,
চমৎকার বিদ্যে বামুন শিখে এসেছে।

(৪)

খুব জাঁকে দিন যায়। এর হাত গণেন, ওর ছুরি গণেন, দেশে দেশে ব্রাহ্মণের বিদ্যার নামে জয় জয় উঠিল।

একদিন, মতি ধোপার গাধা হারাইয়াছে।- মতি ব্রাহ্মণের দুয়ারে আসিয়া ধর্ণা দিল–

“বলে দাও দেবতা আমার উপায় হবে কি গো–
সবে ধন হারিয়েছি খোঁড়া গাধাটি গো।”

ব্রাহ্মণ বলিলেন, –

“চুপ্ থাক্- এখন আমি চণ্ডীপূজো করে
তবে এসে বলব বসে’ থাকগে ওই দোরে।”

না খাইয়া না দাইয়া মতি দুয়ারে পড়িয়া রহিল।

ব্রাহ্মণ ঘরে গিয়া বলেন, –‘বামনি এখন কি করি?- দাও তো দেখি ছাতাটা।’

ছাতা নিয়া ব্রাহ্মণ ঝাঁঝাঁরে রৌদ্রে সারা মাঠ ঘুরিয়াও গাধা পাইলেন না।

তখন,

হাঁপাতে হাঁপাতে এসে, ক্ষুণ্ন অতি মন,
বলিলেন, –‘‘ওরে মতে’! বলি তোরে শোন-
আজ গাধাটা পাবি নাক, যা,
চন্ডী রেগেছেন বড় কি জানি কি করে;
কাল এসে গাধা তুই নিয়ে যাস ঘরে।’’

দেবীর রাগের কথায় মতি
ভয়ে ভয়ে চলে গেল।
তখন সূয্যি ডুবে গেছে,
তারপর রাত্রি হয়ে এল।
ব্রাহ্মণের চিন্তা বড়, –

"বুঝি এইবার
হায় হায় ভেঙ্গে যায় সব ভুরিভাড়।"

রাত্রি হইল; বসিয়া বসিয়া মাথে হাত ব্রাহ্মণ ভাবিতে লাগিলেন–

"যত বিদ্যা খুঙ্গি পুঁথি এইবার ফাঁক
জগদম্ব! কি করিলে!- বিষম বিপাক!"

ভাবিয়া ভাবিয়া ব্রাহ্মণ ঘুমাইয়া পড়িলেন।

অনেক রাত্রে, বা'র আঙ্গিনার কোণে কিসের শব্দ! ব্রাহ্মণ ঘড়ফড় করিয়া জাগিয়া উঠিলেন–

'বামনি বামনি শুনছো, –ওটা হলো কিসের শব্দ?'

ব্রাহ্মণী–

"হাঁ হাঁ- বুঝি চোর এসেছে- করতে হবে জব্দ।"

ব্রাহ্মণীটি আবার চোরের নামে ভয় খেতেন; কাঁদ-কাঁদ সুরে বলিলেন, –"বামনি, তবে আমি নুকুই!"

ব্রাহ্মণী বলিলেন- "তাই তো! এতেই এত বড় পণ্ডিত?- অত পণ্ডিতি ঢলাইয়া কাজ নাই, আমি আলো ধরছি, চোর ধরবে চল।

পরের চোর গণে' নিত্য বেড়ান বাড়ী বাড়ী,
আপন ঘরে সেঁধোলে চোর, করেন তড়বড়ি।"

কি করেন বামুন, 'জারে লোহা কোঁকড়', ডরে ভয়ে কেন্নটি, ঘরে থাকলে রাবণে মারে, বাইরে গেলে রামে মারে, –দশ আঙ্গুলে পৈতা জড়াইয়া 'দুর্গা, -দুর্গা, -জগদম্বা' জপিতে জপিতে ব্রাহ্মণ চোর ধরিতে গেলেন।

''ঐ যে চোর, ধর না!'' ধাক্কা দিয়া বামনী বামুনকে ঠেলিয়া দিল!–

''গ্যাঁ–গ্যাঁ–গ্যাঁ–ঘ্যাঁ–অ্যাঁ–অ্যাঁ–''

''ওমা!- ও আবার কি!''

প্রদীপ নিয়া গিয়া ব্রাহ্মণী দেখেন–

ওমা- এটা তো চোর নয় গো মা-
উবেড়া থুবেড়া পড়ে আছে মস্ত গাধাটা!

বামুনে- গাধায় ঝড়- কম্পন, কুকুর- কুণ্ডলী!

হুমড়ি খেয়ে যখন বামুন উপড়ে পড়ল আসি',
গলায়- দড়া খোঁড়া গাধার লেগে গেছে ফাঁসি।

গাধার গলায ঘড়্ ঘড়্, বামুন করেন ধড়্ ফড়্–

কুকুর কুণ্ডলী

চোখ উল্টে পড়ে' বামুন হয়েছে হাঁ; –
বামনী উঠলেন চেঁচিয়ে- 'হায়! কি হল গো মা!''

পাড়ার লোক ছুটিয়া আসে, –'কি, কি, কি হয়েছে, –ভয় নাই!'

ব্রাহ্মণী বলিলেন, –'না না, কিছু না এই গাধাটা দেখছিলেম।'

–তাড়াতাড়ি ব্রাহ্মণী গাধা নিয়া খুঁটিতে বাঁধিলেন, বামুনকে নিয়া বিছানায় শোয়াইলেন, –তেল, জল, ফুঁ - বাতাস, - সকলে আসিয়া বলে, ''কি, কি, হইয়াছে কি?''

ব্রাহ্মণী বলিলেন, –

''এমন কিছু না, –ঠাকুর বসেছিলেন জপে,
গণে' এনে মতির গাধা এই শুয়েছেন তবে।

হারানো গাধাগণে' আনা শক্ত কম তো নয়?-
তাই একটু অস্থির আছেন জ্যোতিষ মহাশয়।''

কি আশ্চর্য! মন্ত্রের জোরে হারানো গাধা আসিয়া উপস্থিত!
সকলে অবাক!!!

এত তেল জল বাতাস! মূর্ছা ভাঙ্গতেই 'চোর! চোর!' বলে বামুন উঠিয়া বসিল! ব্রাহ্মণী বলিলেন, –

''চোর কোথায় তোমার মাতা, –
ওই দ্যাখ না মতির গাধা খুঁটিতে বাঁধা।''

ব্রাহ্মণ বলিল, –''গাধা?- কৈ, কৈ, মতে'কে ডাক!''

তাড়াতাড়ি ব্রাহ্মণী বলেন, –''চুপ্ কর, চুপ্ কর- এতরাত্রে মতে'! ওগো বাছারা, রাত গেল, তোমরা এখন বাড়ী যাও, –বামুন ঘুমুক।'' সকলে চলে গেল। বামুন জিজ্ঞাসেন, –'তাই তো বামনী, হয়েছিল কি!'

পরদিন মতি আসিয়া দেখে, –গাধা! মতি লম্বা গড়াগড়ি- আঙ্গিনার অর্ধেক ধূলাই, মতি, খাইয়া ফেলিল!

এখন, অমনি বামুনের কাপড় কাচে–তারপর মতি–

এ আশ্চর্য কথা আরো ঘটা ছটা দিয়ে–
রটনা করিল সব গাঁয়ে গাঁয়ে গিয়ে

তখন,

ব্রাহ্মণের ধন্য ধন্য প'ল দেশময়।–
ক্রমে এ কাহিনী রাজ- কর্ণগোচর হয়।

(৫)

রাজকন্যার লক্ষ টাকার হার পাওয়া যায় না। কত জ্যোতিষ, কত পণ্ডিত আসিয়া হার মানিল। 'রুই কাৎলার আটকাট সবই কেবল মালসাট'- শেষে ডাক বামুনকে।

ঢেঙ্গা ঢেঙ্গা পাইক, এ-ই এ-ই আশা- সোটা!- বামুন ভাবেন 'ভাল ভাল ছিলাম বোকা, কপালের না জানি লেখা'- খাঁড়ার তলে ধাড়ি ছাগল, কাঁপিতে কাঁপিতে বামুন রাজ- সভায় গেলেন।

রাজার হুকুম, –

'হার গণে দিতে পার পাবে পুরস্কার,
নৈলে বামুন শেষকালে বাস কারাগার।'

সিধা পত্র চুলোয় যাক, পূজা অর্চনা মাথায় থাক, ব্রাহ্মণ বলিলেন, –"মহারাজ, দু'দিন সময় চাই।"

"আচ্ছা।"

দিনের মতন দিন গেল, রাত এল,

এক, ঘরে, বামুনের ঠাঁই
ঘটি ঘটি জল খায় বামুন করে আই ঢাই, –
“হায় মাগো জগদম্বা, বিপাকে ফেলিলি,
ছায়ে পোয়ে সর্বনাশ, প্রাণে ধনে নিলি
কি করি উঠায় মাগো কি করি উপায়-
জগদম্বা! এই তোর মনে ছিল হায়!”

রাজবাড়ীর জগা মালিনী, জগদম্বা নাম, –
সেইখান দিয়া যাচ্ছিল, –
খপ করে থামে জগা- ধুকু ধুকু প্রাণ।

আর কথা, আর বার্তা- “দোহাই ঠাকুর, দোহাই বাবা!- যা’ বল বাবা তাই করি- রাজার কাছে যেন আমার নামটি করো না!” জগা ছুটিয়া গিয়া বামুনের দুই পা সাপটিয়া পড়িল।

বামুন চমৎকার!- “এ আবার কি!- কে তুমি, কে তুমি! আমি কি করেছি- আমাকে কেন?”

“না বাবা ঠাকুর, তুমি সব জেনেছ, আমি আর এমন কর্ম করব না; –

দোহাই বাবা, আমাকে রক্ষা কর, লোভে পড়ে’ আমি রাজকন্যার হার নিয়েছিলাম।–দোহাই বাবা, পায়ে তোর পড়ি বাবা!”
তখন বুঝিলা ব্রাহ্মণ, কি করে কি হ’ল-
‘জগদম্বা’ নাম নিতে জগা ধরা দিল!

তখন, ব্রাহ্মণের ধড়ে এল প্রাণ, –ধীর সুস্থির মহাপণ্ডিত হইয়া বলিলেন, –“যা করেছিস, করেছিস, তোর ভয় নাই, হাঁড়ির ভিতর যেন হার থাকে; রাখ নিয়া খিড়কী পুকুরের পাঁকে; তাতে যেন ভুলটি না হয়।”

দুই চক্ষের জল ছেড়ে, জগা বাঁচে, –তখনি হার নিয়া খিড়কী পুকুরে রাখিয়া আসিল।

পরদিন, –গা- ময় তিলক ছাপা চিতা- বাঘের ঠাকুর- জামাই, - তিন নামাবলী গায়ে, তিন নামাবলী গলায়, বড় বড় রুদ্রাক্ষের মালা, ফুলের ভারে টিকি ঝোলা, খুঙ্গি, পুঁথি, ছাতি, লাঠি, সকল নিয়া ব্রাহ্মণ রাজার সভায় গিয়া উপস্থিত।

টিকি নাড়ে মন্ত্র পড়ে, ভঙ্গী ছঙ্গী কত
এ পুঁথি ও পুঁথি খোলে পুঁথি শত শত!

গণিয়া গণিয়া আঙ্গুল ক্ষয়, –কত শত খড়ি পাতে, কত শত মাটি আঁকে, –অনেক ক্ষণের পর,

“শুন শুন মহাশয়! পেয়ে গেছি হার,
নিশ্চয় সে রহিয়াছে পুকুরে তোমার।”

“খোঁজ্ খোঁজ্!” - পুকুরের জল দৈ, –কিন্তু হার মিলিল কৈ?- রাজা বলেন,

“হা রে হা রে, চতুরালী করেছ বচন,
না রাখ প্রাণের ভয়, কেমন ব্রাহ্মণ!”

‘‘দোহাই মহারাজ!’’–ভ্যাঁ করে’ বামুন কাঁদে আর কি, –

‘‘আমার ভুল নাই, –মহারাজ, তবে সত্যি এ সব জগদম্বার কাজ!’’

রাজা বলিলেন, –‘‘ঠিক!- হতে পারে দশার দশা, আচ্ছা, না হয় আবার খোঁজ!- তা, বামুনকে বাঁধ, যেন না পালায়।’’

আবার খোঁজ্ খোঁজ্–

কাদার তলেতে এক পাওয়া গেল ভাঁড়;
ভেঙ্গে দেখে, ঝলমল হার মাঝে তার।

পাওয়া গেল, পাওয়া গেল! বামুনের বাঁধ খুলে’ গেল,

সিংহাসন ছেড়ে রাজা পড়ে এসে পায়–
‘‘আজ হতে হৈলা তুমি পণ্ডিত সভায়।’’

আনন্দে ব্রাহ্মণ মূর্ছা- ই গেল। এবার কিন্তু সে চোর ধরার মূর্ছা নয়। তা’ না হক তা’ ভালই, –তা’র পর? তারপর?

ধন রত্ন, মণি মোতি, ছড়াছড়ি যায়
নিত্য গিয়া বসে ব্রাহ্মণ, রাজায় সভায়।
দিকে দিকে হতে আসে পণ্ডিত বড় বড়,
আমাদের পন্ডিতের নামে ভয়ে জড়সড়।

রাজা দেন পাদ্য অর্ঘ্য রাণী দেন পূজা,
জগা নিত্য যোগায় ফুল, –
ঠাকুর পূজেন দশভূজা।

তখন-

ত্রিতল প্রাসাদে সেই আগের ব্রাহ্মণ
সোনার খাটেতে রন করিয়া শয়ন।

আর–

তেলে ভান্ডার ভেসে যায়, গায়ে ধরে না গয়না,
ব্রাহ্মণী তো ভারী খুশী, –হেসে ছাড়া কয়- ই না।

এখন-

রোজই বামুন পিটা খায়-
'আহা লক্ষ্মী অতি।'

শুনে' বামনী হেসে কুটি কুটি, – মনের সুখে-

পতিসেবা করিতে লাগিলা সুখে সতী।

দেড় আঙ্গুলে

খুনখুনে' বুড়ী

(১)

এক কাঠুরিয়া। ছেলে হয় না পিলে হয় না, সকলে ‘‘আঁটকুড়ে আঁটকুড়ে’’ বলিয়া গালি দেয়, কাঠুরিয়া মনের দুঃখে থাকে।

কাঠুরিয়া- বউ আচারনিয়ম ব্রত উপোস করে, মা- ষষ্ঠীর- তলায় হত্যা দেয়- ‘‘জন্মে জন্মে, কত পাপই অর্জে ছিলাম মা, কাচ্চা হক্ বাচ্চা হক্ অভাগীর কোলে একটা কিছু দে মা, ভিটে বাতির নি’র্শন থাক।’’

কাঁদিতে, কাঁদিতে- মা ষষ্ঠী এক রাতে স্বপন দিলেন, –‘‘উঠ্ লো উঠ্,

তেল সিঁদুরে না'বি ধুবি, শশা পা'বি শশা খা'বি।
কোলে পাবি সোনার পুত বুকজুড়ানো মাণিকটুক্।''

কাঁচা পোয়াতীর ঘুম ভাঙ্গে নাই, কাক পক্ষী মাটি ছোঁয় নাই, ভোর জ্যোছনায়, এক কপাল সিঁদুর আঁজলপূরা তেল মাথায় দিয়া কাঠুরে-বউ ষষ্ঠীমা'র ঘাটে নাইয়া ধুইয়া ডুব দিয়া আসিল।

আদেশ হইয়াছে, আর কি! ''শশা যদি পাস শশা খাস্'' বলিয়া, মনের আনন্দে কাঠুরিয়া কাঠ কাটিতে বনে গেল।

বনে ঝরণার পাড়ে একশ' বচ্ছুরে খুনখুনে' এক একরত্তি বুড়ী! ''কে বাছা আঁটকুড়ে' কাঠুরিয়া? চক্ষেও দেখি না মক্ষেও দেখি না ছাই, –এই নে বাছা, এইটে নিয়ে বউকে দিস, কিছু যেন ফেলে না, সাতদিন পরে যেন খায়, চাঁদপানা টলটল হাতী হেন ছেলেটা-কোলজোড়া- ঘর আলো করবে।'' এতটুকু এক থলে খুলিয়া ছোট্ট এক শশা কাঠুরের হাতে দিয়া গুটি গুটি বনের মধ্যে চলিয়া গেল।

আর কাঠ কাটা! - এক দৌড়ে কাঠুরিয়া বাড়ী, ''ও অভাগী আঁটকুড়ি! - এই দ্যাখ, এই নে হাতে- পাতে মা- ষষ্ঠীর বর! আজ যেন খাস নি, সিকায় তুলে রাখ, সাত দিন পরে খা'বি।'' মনের আহ্লাদে তিন খাবল তেল মাথায় দিয়া কাঠুরিয়া নাইতে গেল। কিছু যে ফেলিতে মানা, মনের ভুলে কাঠুরিয়া তা' বলিয়া গেল না।

''সাত দিন না সাত দিন!'' মা ষষ্ঠী বলেছেন, –'শশা পা'বি শশা খা'বি।' হাতে পায়ে জল দিয়া ''মা ষষ্ঠী, মা ষষ্ঠী'' নাম নিয়া,

কাঠুরে- বউ বোঁটা সোটা ফেলিয়া কপালে কণ্ঠায় ছোঁয়াইয়া কুচমুচ্ শশাটি খাইয়া ফেলিল।

নাইয়া দাইয়া আসিয়া কাঠুরিয়া দাওয়ায় খাইতে বসিবে, দেখে শশার বোঁটাটা!- ‘‘ও সর্বনাশি!’’- শশা তো খাইয়াছে!- ‘‘আ অভাগী কুলোকানি!- করেছিস কি রাক্ষসী!- খেলি তো খেলি, বোঁটা কেন ফেললি! শীগগির তুলে খা!’’

‘‘ওমা- কি হয়েছে?’’ থতমত কাঠুরে- বউ বোঁটা তুলিয়া খাইল। গালে মাথায় চাপড় দিয়া কাঠুরিয়া ভাতের থাল ছুঁড়িয়া ফেলিল।

(২)

আর কিসে কি!- এত ধর্ণা, এত কর্ণা, কাঠুরে- বুউর যে ছেলে হইল- ও মা!- ‘জন্মিতে জন্মিতে বুড়ীর চুল দাড়ি আঠারো কুড়ি। এক দেড় আঙ্গুলে’ ছেলে’, তা’র তিন আঙ্গুলে’ টিকি!

‘‘না বলতে শশা খেলি, বুড়ীর শাপে পাতাল গেলি!’’ দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া রাগিয়া মাগিয়া দড়িকুড়াল নিয়া কাঠুরিয়া একদিকে চলিয়া যায়!- ‘‘সাত দিন পরে খেলে হাতীর মতন ছেলে হইত, বোঁটাটা হাতীর শুঁড় হইত!- তা নয়, –হয়েছেন এ টিকটিকি, –বোঁটা হয়েছেন তিন আঙ্গুলে’ এক টিকি- এক বিঘত ধানের চৌদ্দ বিঘত চাল।’’

কাঠুরে- বউ তো ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

“ওঙা, ওঙা!” ছেলে কাঁদে, কে নেয় কোলে, কে করে যতন, কাঠুরে’ তো গেলই, কাঠুরে-বউ নদীর জলে ঝাঁপ দিয়া মরিতে চলিল- “দিলি দিলি এমন দিলি! মা ষষ্ঠী, তোর মনে এই ছিল!”

আঙ্গুল চুষিয়া দেড় আঙ্গুলে’ ছেলে খাড়া হইল! দৌড়িয়া গিয়া তিন আঙ্গুলে’ টিকি দিয়া মায়ের পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, –“মা, মা! যাসনি আমায় একটু দুধ দে।”

“মা!- জন্মিয়াই ছেলে কথা কয়! সামান্যি তো নয় মা, সামান্যি তো নয়!” চোখের জল মুছিয়া “ষাঠ্ ষাঠ্” ধুলা ঝাড়িয়া কাঠুরে- বউ ছেলে তুলিয়া কোলে নিল।

পেট ভরিয়া দুধ খাইয়া দেড় আঙ্গুলে’ বলিল, “মা, এখন নামিয়ে দে, বাবাকে নিয়ে আসি!”

(৩)

বাবা কোন্ রাজ্যে কোথায় গেছে, তুরতুর করিয়া দেড় আঙ্গুলে’ পথ ঘাট ছাড়ায়। পিঁপড়ে আসে, গুবরে আসে, ফড়িং যায়- দেড় আঙ্গুলে’র সঙ্গে কেউ পারে না; দেড় আঙ্গুলে’ হটিং হটিং করিয়া হাঁটে, ফটিং ফটিং করিয়া নাচে। হাঁটিতে হাঁটিতে, নাচিতে নাচিতে এক রাজার বাড়ীর কাছে গিয়া দেড় আঙুলে’ দেখে, ঠা ঠা রৌদ্রে মাথার ঘাম পায়ে, তার বাবা, কাঠ কাটিতেছে।

দেড় আঙ্গুলে’ বলিল, –“বাবা, আমায় ফেলে এলি কেন?- বাড়ী চল। মা কত কাঁদছে।”

কাঠুরে অবাক!- ছেলে তো সামান্য নয়!- বুকে তুলিয়া চুমা খাইয়া বলিল, –“বাপ আমার সোনা কি করে যাই, রাজার কাছে আপনা বেচেছি।”

দেড় আঙ্গুলে’ রাজার কাছে গেল।
“রাজা মশাই, রাজা মশাই, রাজ- রাজ্যের কাঠ কাটে কে?”

রাজা–“কে রে তুই?–কাঠ কাটে অচিন দেশের
নচিন কাঠুরে।”

দেড় আঙ্গুলে’–“কাঠুরেটি কোথায় থাকে?
কাঠুরেটি দাও না মোকে।”

রাজা–“নিয়ে এল হাটুরে’, কড়ি দিয়ে কিনলাম কাঠুরে’–
ব্যাটা বড় মস্তকী, সেই কাঠুরে’ তোরে দি।”

দেড় আঙ্গুলে’ বলিল, –“তবে কি?”

রাজা- “নিয়ে এসে কড়ি,
তবে আসিস রাজ- রাজড়ার পুরী।”

শুনিয়া, দেড় আঙ্গুলে’ গিয়া বলিল, –“বাবা, তুমি কিছু ভেবো না, আমি দেখি, কড়ি আনতে চল্লাম।”

(৪)

ভাঁটার মতন ছোটে, কুতুর কুতুর হাঁটে- একখানে আসিয়া দেড় আঙ্গুলে' দেখিল এক খাল। কেমন করিয়া পার হইবে? বসিয়া বসিয়া দেড় আঙ্গুলে' ভাবিতে লাগিল।

পিছনে, টিকিতে ইয়া এক টান!– ''হেই দেড় আঙ্গুলে' মানুষ তিন আঙ্গুলে' টিকি! তুই কে রে?'' টিকির টানে চিৎপটাঙ, তিন গড়াগড়ি দিয়া উঠিয়া চটিয়া মটিয়া দেড় আঙ্গুলে' বলিল, –''আমি যে হই সে হই, তুই বেটা কে রে?''

ব্যাঙ বলিল, –''ব্যাঙ রাজার রাজপুত্তুর রঙ, সুন্দর ব্যাঙ।''

দেড় আঙ্গুলে' বলিল–''তোর নাক কাটব কান কাটব,
কাটবো দুটো ঠ্যাং।''

ব্যাঙ ''হো হো'' করিয়া হাসিয়া ফেলিল, –

''টিং টিঙা টিং টিঙা। কাটবি কি তুই ঝিঙা।
নাকও নাই, কানও নাই, ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ্গ্ ঘিঙা।''

বলিয়া ব্যাঙ নাচিতে লাগিল। দেড় আঙ্গুলে' বড়ই ঠকিয়া গেল।

নাচিয়া নুচিয়া ব্যাঙ বলিল–''ভাই, তুই কি রে?''
''কাঠুরে।''
''তবে তোর কুড়ুল কৈ রে?''

"নাই রে!"

"দুয়ো!- উতুরে এক কামার আছে, এক কড়া কড়ি দিয়া কুড়ুল নিয়া আয়।"

দেড় আঙ্গুলে' বলিল, –"না ভাই, আমি কড়ি কোথায় পাব? কড়ি নাই বলেই তো বাবাকে আনতে পারলেম না। আমি ছোট ছেলে মানুষ, আমার কিছু আছে কি না। তোর থাকে তো ধার দে না ভাই?"

"ও বাবা"- ব্যাঙ চমকিয়া উঠিল- "আমার মোটে কানা এক কড়ি, তাই তোমাকে দি!- ঘ্যাংঙ ঘ্যাংঙর ঘ্যাঙ।"- লাফে লাফে ব্যাঙ চলিয়া যায়।- "তা যদি কুড়ুল আনিস তো- "

দেড় আঙ্গুলে' বলিল, –"আচ্ছা, –কুড়ুল- কোন্ পথে বলিয়া দে।"

"তবে যা!"

পথের কথা বলিয়া দিয়া ব্যাঙ কচুর পাতার নীচে বসিয়া রহিল।

একখানে এক ছোট্ট ঘর, তারি মধ্যে এক আড়াই আঙ্গুলে' কামার তিন আঙ্গুল দাড়ি নাড়িয়া এক পৌনে আঙ্গুল কুড়াল আর এক কাস্তে গড়িতেছে।

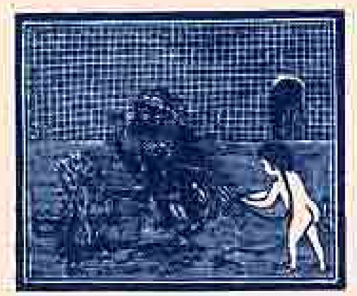
টিকিটি বাঁধিয়া দিয়া

কড়ি নাই ফড়ি নাই, কি দিয়া কি করে?- তা কুড়ুল না নিলেও তো নয়! চুপ্টি চুপ্টি, আড়াই আঙ্গুলে' কামারের পিছনে গিয়া, দাড়ির সঙ্গে টিকিটি বাঁধিয়া দিয়া দেড় আঙ্গুলে' "চ্যাঁ ম্যাঁ" করিয়া চেঁচাইয়া একলাফে একেবারে আড়াই আঙ্গুলে'র ঘাড়ে!

"আ–আ আমঃ! রাম রাম–দুগগা–দুগগা!! দুগগা!!!" বুড়া ছিটকাইয়া উঠিয়া ডরে ঠি ঠি করিয়া কাঁপে। কি না কি, –ভূত না প্রেত!!

হাসিতে হাসিতে পেট ফাটে, হাসিতে হাসিতে গলিয়া পড়ে, নামিয়া আসিয়া দেড় আঙ্গুলে' বলিল, –"কামার ভাই, কামার ভাই; ডরিও না, তোমার সঙ্গে মিতালী!"

মিতালী আর ফিতালী- আড়াই আঙ্গুলে' খুব রাগিয়া গিয়াছে, বলিল, –"কে রে তুই? ঘরে যে উঠিয়াছিস কড়ি এনেছিস?"

ও বাবা! সকলেই কড়ি!- "সে কি ভাই, কড়া কড়ি আবার কিসের?"

"আমার ঘরে উঠলেই কড়ি!"

"তবে ভাই টিকি খুলিয়া দাও, আমি যাই!"

আড়াই আঙ্গুলে' টিকি খুলিতে খুলিতে টিকির এক চুল ছিঁড়িয়া গেল। চোখ রক্ত করিয়া তখন দেড় আঙ্গুলে' বলিল, –''এইও বড়ো! আমার টিকি ছিঁড়ল যে!- এইবার কড়ি ফ্যাল।''

কামার বুড়ো ভ্যাবাচাকা; বলিল, –''অ্যাঁ- অ্যাঁ- তা' ভাই, কড়ির বদল কি নিবে নাও।''

তখন দেড় আঙ্গুলে' কড়ির বদলে কুড়ুলটি চাহিয়া, বলিল, –''আজ থেকে তোমায় আমায় মিতালী।''

কুড়ুল আনিলে ব্যাঙ বলিল, –''ভাই দেড় আঙ্গুলে', আমি ব্যাঙ-রাজার ব্যাঙ রাজপুত্র, এক কুনোব্যাঙী বিয়ে করেছিলাম, তাই বাবা আমাকে বনবাস দিলেন। আমার কুনোরাণী ঐ ভেরেন্ডা গাছে লাউয়ের খোলসের মধ্যে, –তার সঙ্গে আর কিছুই নাই, কেবল এক ঘাসের চাপাটী আর এক সাতনলা আছে। তুমি ভাই গাছটা কাটিয়া আমার কুনোরাণীকে পাড়িয়া দাও।''

ঠকাঠক্

বলতে না বলতে পৌনে আঙ্গুল' কুড়ুল ঠকাঠক! দেখিতে দেখিতে হড়্ মড়্ করিয়া গাছ পড়িল।

খোলসটি কিনা মস্ত বড় উঁচু? হাঁ করিয়া খাড়া হইয়া রহিল! টানিয়া টুনিয়া ব্যাঙ বলিল, –''ভাই, এত করিলে অত করিলে,

সব মিছা!'' চক্ষের জলে ব্যাঙের বুক ভাসে।

দেড় আঙ্গুলে' বলিল, –''রও!'' চটপট ডালের উপর উঠিয়া চিৎ হইয়া, টিকিটি খোলসের মুখে ঝুলাইয়া দিয়া বলিল, –

''কুনোরাণী, কুনোরাণী জেগে আছ কি?
শক্ত করে ধরে উঠ, সিঁড়ি দিয়েছি।''

টিকি ধরিয়া কুনোরাণী উঠিয়া আসিল!

ব্যাঙ বলিল, –''ভাই, ভাই, আমার কানা কড়িটি নাও। এইটি দিয়ে তোমার বাপকে কিনিয়া নিও।''

কুনোরাণী বলিল, –''রাজার জামাই দেড় আঙ্গুলে', আমার এই থুথুটুকু নাও, রাজার কানা রাজকন্যা- ইহাই নিয়া রাজকন্যার কানা চোখ ফুটাইও!''

সাতনলা আর খোলসটি বলিল, –

''রাজার জামাই দেড় আঙ্গুলে' সাবাস সিপাহি!
মোদের নাও সাথে করে' পাবে রাজার ঝি।''

সব নিয়া দেড় আঙ্গুলে' বলিল, –''এখন ভাই আসি?''

(৫)

আবার হটিং হটিং, আবার ফটিং ফটিং; রাজার কাছে গিয়া দেড় আঙ্গুলে' হাঁক ছাড়িল, –

"রাজা মশাই, রাজা মশাই, কড়ি গুণে' নাও,
আপন কুড়ি বুঝ পড়; কাঠুরেটি দাও।"

রাজা কড়ি গুণে, বুঝে নিয়ে, –টিকিতে তিন টান, দুই গালে দুই চাপড়, দেড় আঙ্গুলে'কে খেদাইয়া দিলেন, –

"তের নদীর পারে আছে সাত চোরের থানা,
তারি কাছে দিব বিয়ে রাজকন্যা কানা।

সেই চোরদিগে আগে নিয়ে এসে, কথা ক'।"
দেড় আঙ্গুলে' আবার ব্যাঙের কাছে গেল, –

"রঙসুন্দর রাজপুত্তুর কোথায় আছ ভাই!
তের নদী পার হব, দুটো কড়ি চাই।"

ব্যাঙের তখন মেলাই কড়ি; বলিতে না বলিতে ব্যাঙ কড়ি আনিয়া দিল। দুই কড়ির এক কড়ি দিয়া দেড় আঙ্গুলে' তের নদী পার হইয়া, কোথায় সাত চোর, তাদের খোঁজে চলিতে লাগিল!

সারাদিন খুঁজিয়া পাইল না, –আনেক দূরে এক উইয়ের ঢিপির কাছে গিয়া সন্ধ্যা। সারাটি দিন খায় নাই, আজো বাবাকে পায় নাই;

গা অলস, মন অবশ, উইয়ের টিপির তলে কুড়ুল শিয়রে দিয়া দেড় আঙ্গুলে শুইতে শুইতেই ঘুমাইয়া পড়িল।

অনেক রাত্রে, সাত চোর তো নয়, –সাড়ে সাত চোর সেইখান দিয়া চুরি করিতে যায়। অন্ধকারে কিছু দেখে না, সাড়ে সাত চোরের আধখানা- চোর ছোট- চোরের পা দেড় আঙ্গুলে'র ঘাড়ে পড়িল; ধড়মড় উঠিয়া দেড় আঙ্গুলে' চোরের পায়ে কুড়ুলের এক কোপ।- ‘‘কে রে ব্যাটা নিমকানা, চলেন তিনি পথ দেখেন না।’’

ছোট চোর হাঁউ হাঁউ করিয়া চেঁচাইয়া তিন লাফে সরিয়া গেল; সকল চোর অবাক, –জন নাই প্রাণী নাই, মাঠির নীচে কথা! ‘‘দোহাই বাবা দৈত্য দানা, ঘাট হয়েছে, আর হবে না।’’

শুনিয়া দেড় আঙ্গুলে' বড় খুশী হইল, বলিল, –‘‘যাক ভাই, যাক ভাই- তা ভাই, তোরা কে রে ?’’

সাড়ে সাত চোর বলে, –‘‘আমরা সাড়ে সাত চোর, –

মাটি ফুঁড়ে কথা কও, তুমি তো ভাই কম নও,
তুমি ভাই কে?’’

‘‘আমি ভাই, মানুষ, –এই যে আমি, এই যে!- তোমরা ভাই, কোথা যাচ্ছ ভাই?’’

উঁকি ঝুঁকি, হাতাড়ি পিতাড়ি- শেষে ছোট্ট চোর দেখে–ও বাববা– এক একটুখানি দেড় আঙ্গুলে', তার আবার কুড়ুল হাতে! হাত তুলিয়া চোখের কাছে নিয়া দেখে, –ওঁম্মা!–

তিনি আবার টিকি ফর্ ফর্ তিন ভঙ্গী রাগে গর্ গর্-
টিকির আগে ভোমরা, ইনি আবার কোন্ দেশী চেঙ্গরা?

হো হো! হি হি ! হু হু ! হা হা ! হে হে ! হৈ হৈ! হৌ হৌ!!- হঃ হঃ। সাড়ে সাত চোরে যে হাসি। গলিয়া ঢলিয়া গড়া- গড়ি!!

সাড়ে সাত চোর

শেষে কোন মতে তো হাসি থামুক; চোরেরা বলিল, - "চল্ রে চল্ আড়াইয়ের বাড়িতে যাই।"

দেড় আঙ্গুলে' জিজ্ঞাসা করিল, –"আড়াইয়ে কে ভাই?"

"তুই হলি দেড়কো, তুই জানিস নে ? ওপারে আড়াইয়ে এক কামার আছে, সাড়ে সাতটা সিঁদ- কাটি দিবে, ব্যাটা রোজ ফাঁকি দেয়, আজ সেই বুড়োকে দেখাব।"

দেড় আঙ্গুলে' দেখিল, –ওরে! তা'র সঙ্গে আমার মিতালী, তারি ঘরে সিঁদ দেবে?- বলিল, –

"ও ভাই! সে বাড়ী যাস নি,
সে বাড়ীতে আছে শাকচুন্নী;
ঘাড়টি ভেঙ্গে রক্ত খাবে,
সাড়ে সাত গুষ্টি এক্কেবারে যাবে।

তা' তো নয়, রাজকন্যা বিয়ে করিস তো, রাজার বাড়ী চল।"

চোরেরা "হি হি হি! হে হে হে ! হৈ হৈ হৈ! সে তো ভালই, সে তো ভালই!" তা রাজার জামাই হবে, তারা কি যে সে! গোঁফে তা, গায়ে মোড়ান চোড়ান, বলিল, –"তা

যেখানে যেতে উথাল পাতাল তের নদীর জল।"

দেড় আঙ্গুলে' বলিল, –"কেন, এই যে ওপার যাচ্ছিলি!"

"যাচ্ছিলুম তো যাচ্ছিলুম, করতে যেতুম চুরি, –
রাজার জামাই হব, তাও দিয়ে আপন কড়ি?"

দেড় আঙ্গুলে' বলিল, –"আচ্ছা, একটা কড়ি আছে, নিয়ে চল!"

কড়ি নিয়া ভারী খুশী সাড়ে সাত চোর নদীর পাড়ে গিয়া ডাকিল, –

"হেই হেই পাটনি! রাত জাগা খাটুনী, –
করবি পার পাবি কড়ি তাতে কেন গড়িমড়ি?-
পাটনী না পাটুড়ী বজ্জর বাঁধের আঁটুনী।
কানা কড়ির আশটা কানা কড়ির বাসটা
রাজবাড়ীর মাছটা বিড়ালে খায়,

হেদে হেদে পাটনি, ঝট্ পট্ পার করে নে ভাঙ্গা নায়!!''

কড়ি নিয়া, পাটনী, ভাঙ্গা নায়ে করিয়া পার করিয়া দিল। নামিবার সময় চোরেরা আবার কড়িটি চুরি করিয়া নিল। দেড় আঙ্গুলে' বলিল, –''না ভাই, কড়ি ফিরিয়ে দিয়ে এস।''

''হুঁ! দিব না তো কি, সাত হাঁড়ি ঘি!'' চোরেরা মুখটা নাড়া দিয়া উঠিল।

দেড় আঙ্গুলে' আর কিছুই বলিল না।

যাইতে যাইতে রাজার বাড়ী। দেড় আঙ্গুলে' গিয়া রাজার দুয়ারে ঘা দিল, –

''রাজামশাই, রাজামশাই, খাট পালঙ্ক ছাড়,
পার হয়ে না দেয় পারের কড়ি, কেমনে ঘুম পাড়?''

চোরেরা থর থর কাঁপে। রাজা বলিলেন, –''কে! পারের কড়ি না-দেয় তারে শূলে চড়িয়ে দে।'' সাড়ে সাত চোর শূলে গেল।

''শূলে গেল কি সাত চোরেরা? হায়! হায়! হায়!'' রাজা কাঁদেন, রাণী কাঁদেন, কানা কন্যা কাঁদেন, দেড় আঙ্গুলে' বলিল, –''চোর তো আমি এনে দিয়েইছিলাম, তা' রাজকন্যার বর হবে, না, আপন দোষে শূলে গেল, - তা'র আমি জানি কি ? রাজামশাই, কাঠুরে' দাও!''

''কিরে!- বারে বারে ভ্যান্, ভ্যান্ বারে বারে ঘ্যান্ ঘ্যান্!
দে তো নিয়ে ক্ষুদে'টাকে চোরেদের সঙ্গে!''

ফুট্!- দেড় আঙ্গুলে'কে কেউ খুঁজিয়াই পাইল না।

চোরের রাজ্যে, চোরের রাজা, সাড়ে সাত চোরের শূলের কথা শুনিল।

নায়ে নায়ে ভরা দিয়ে যত রাজ্যের চোর আসিয়া রাজার রাজপুরীময় চুরি আরম্ভ করিল। সিপাহী শান্ত্রী ধোঁকা, রাজা হলেন বোকা!–নিতে নিতে–

চাটি নিল বাটি নিল, সব নিল চোরে,
মাটি পেতে পান্তা খান, রাজা মনে মনে পুড়ে'।

তখন, –"চোরের বাদী সেই ক্ষুদে' তারে এখন এনে দে!"

কোথায় বা ক্ষুদে', কোথা খুঁজিয়া পায়! দেড় আঙ্গুলে' ঘাসবন থেকে হাসিতে হাসতে আসিয়া বলিল, –"রাজামশাই, রাজামশাই,

এত এত সিপাই চোরের কাছে ঢিপাই;
আমার কাছে ঘুরসুড়নি এমন সিপাই জন্মেও নি।

তা' যদি বল' তো সব চোর তাড়িয়ে দি!"

"আচ্ছা, কি চাও?"

"রাজকন্যা চাই।"

"ইস্ কথা দেখ!- আর কি?"

"পুরীর রাজা হুলো বেড়ালটি।"

"আর কি?"
"পোষাক আষাক, হীরের পাগড়ী।"

রাজা সব দিলেন, কেবল বলিলেন, –"চোর যদি ছাড়ে পুরী, তবে কন্যা দিতে পারি।" কানা কন্যা গেলেই কি, থাকলেই কি।

তখন কেশ-বেশ পোষাক করিয়া হুলোবেড়াল ঘোড়া, সাতনলা হাতে, টিকির নিশান মাথে, টিকিতে খোলস বেঁধে, দেড় আঙ্গুলে' চোরের রাজ্যে গিয়া হানা দিল।

কোথা দিয়া কোথা দিয়া যায়, বিড়ালে হাঁড়ি খায়, –যত চোরনী পরেশান! খোনা, খুন্তি, পোলো, থোলো, রায়বাঁশ, গলফাঁস, সকল নিয়া রাজ্যের যত চোর অলিতে গলিতে খাড়া হইল, খানা খুঞ্জি ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

দেড় আঙ্গুলে' বলিল, –"আচ্ছা রও!

সাতনলা, সাতনলা, করছ এখন কি?
চুপটি করে আছ কেন লাউয়ের খোলসটি?"

সাতনালা বলিল, –"কি?"
খোলস বলিল, –"কি?"

হুলোবেড়াল ঘোড়া

নল চিরিয়া হাজার চুল, খোলস ফেটে ভীমরুল! চেরা চেরা নল সূঁচ হেন ছোটে, ভীমরুলের হুল পুটপুট্ ফোটে।–

"আঁই মাঁই কাঁই; বাবা রে! মা রে! তালুই রে! শ্বশুর রে।"–

চোরের রাজ্যে হুড়াহুড়ি গড়াগড়ি, লটাপটি ছুটাছুটি!- তিন রাত্তিরে ঘর দোর ফেলে যত চোর চোরনী দেশ ছেড়ে পালিয়ে পুলিয়ে দূর!- চোরের রাজা 'চ্যাং পিছলে'; চ্যাং-পিছলেকে বাঁধিয়া নিয়া দেড় আঙ্গুলে' টিকি ফরর্ ফরর্ পাগড়ী ফুলাইয়া নল ঘুরাইয়া রাজার কাছে গেল, –

"রাজামশাই, রাজামশাই, রাজকন্যা আর
কাঠুরে দাও।"

তখন রাজা বলেন, –"তাই তো! তাই তো!–

বীরের চূড়া পিপ্পল কুমার এস রে বাপ, এস,
তোমার তরে রাজ্য ধন, সিংহাসনে বস।
কন্যা আছে চোখ-বিধুলী, দিলাম তোমায় দান-
কাঠুরেরে আন দিয়ে পুষ্পরথ খান।"

পুষ্পরথে চড়িয়া কাঠুরিয়া আসিল।

তখন, কুনোরাণীর থুথু দিয়া দেড় আঙ্গুলে' পিপ্পল কুমার রাজকন্যার চোখ ফুটাইল, – ব্যাঙ এল, কুনোরাণী এল; দেড় আঙ্গুলে' গিয়া কামার- মিতাকে আনিল। ধুম ধাম বিয়ে সিয়েয় রাজ-রাজ্য তোল- পাড়!

লাফে লাফে ব্যাঙ নাচে,
দাড়ি নাড়িয়া কামার হাসে।

মায়ের দুঃখ গেল, বাপকে সোনার কুড়ুল গড়ে' দিল; তখন রাজা শ্বশুর, রাণী শাশুড়ী, জামাই বেয়াইকে' রাজ্য দিয়া, তপস্যায় গেলেন; –দেড় আঙ্গুলে' পিপ্পল কুমার এক বেলা রাজ্য করে, এক বেলা বাপের সাথে কাঠ কাটে–

খুট্–খুট্–খুট্!!

আম সন্দেশ

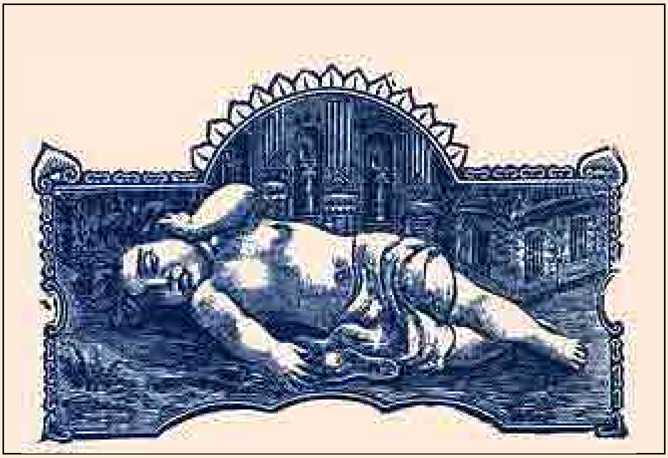

সোনা ঘুমা'ল

খোকন্ সোনা   চাঁদের কোণা, —
        খোকার মাসি এল দেশে'
আকাশের চাঁদ   পাতালের চাঁদ
        ধরে এনেছে...ছে! —
জ্যোচ্ছনা জ্যোচ্ছনা,   ফটিক ফুটেছে
        দেখি চাঁদ দেখি চাঁদ
        কোন দেশের ফল?—
দুই পাড়েতে ফেটে' পড়ে
        রূপ ঝল মল্।
দুই পাড়ে রে   রূপের সাগর,
        গোলায় আছে ধান্, —

মায়ের কোলে শোন্ রে যাদু
ঘুম পাড়ানি গান।
শুনে' শুনে' খোকন মনির
দু—পু—র রাত, —
কেঁদে যে চাঁদ ফিরে' গেল,
কেউ দিল না ডাক।
কেউ দিল না ডাক রে—খোকন ঘুমিয়ে পড়েছে,
খেয়ে খোকন আম- সন্দেশ ধূলায় লুটেছে!
ধূলার বড় ভাগ্যি, খোকন গায়ে মেখেছে!
খোকার মা লো খোকার মা!
তোর সোনা ঘুমা'ল—
আঁচল পেতে তুলে নে' যা—
পাড়া জুড়া'ল।
ও—মা লো মা!
এমন দস্যি ছেলে—তা'র ঘুম আসে না! !

* * সমাপ্ত* *

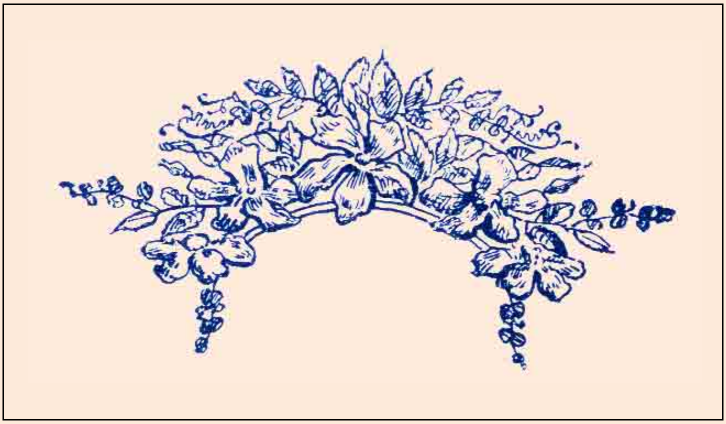

ফুরাল

আমার কথাটি ফুরা'ল,
নটে গাছটি মুড়াল।
"কেন রে নটে' মুড়ালি?"
"গরুতে কেন খায়?"
"কেন রে গরু খাস্?"
"রাখাল কেন চড়ায় না?"
"কেন রে রাখাল চড়াস না?"
"বৌ কেন ভাত দেয় না?"
"কেন লো বৌ ভাত দিস না?"
"কলাগাছ কেন
পাত ফেলে না?"
"কেন রে কলাগাছ
পাত ফেলিস না?"
"জল কেন হয় না?"
"কেন রে জল হ'স্ না?"
"ব্যাঙ কেন ডাকে না?"

"কেন রে ব্যাঙ ডাকিস্ না?"
"সাপে কেন খায়?"
"কেন রে সাপ খা'স?"
"খাবার ধন খা'ব নি? গুড় গুড়ুতে যা'ব নি?"